হকিকতে মুসলমান-ই বাংগালা
খন্দকার ফজলে রাব্বি
www.draminlibrary.com

প্রসংগ-কথা

বাংগালী মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করেন। এদেশের মুসলমান সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ পরিবেশন করেছেন তার মধ্যে বহু ভুল-ভ্রান্তি বিদ্যমান।

স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে নিজের প্রকৃত ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া এদেশের মুসলমানের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বাংলা একাডেমী বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণার সংগে সংগে উপরোক্ত কাজেও আত্মনিয়োগ করেছে। এদেশের মুসলমান তার উৎপত্তি সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হোক, এ উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা একাডেমী জনাব খন্দকার ফজলে রাব্বির 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস্‌ অব বেংগল' নামক গ্রন্থখানির অনুবাদ প্রকাশের উদ্যম গ্রহণ করেছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে খন্দকার ফজলে রাব্বি মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তাঁর এ পুস্তকখানি এক সময়ে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

গ্রন্থখানিতে পরিবেশিত কোন কোন ঐতিহাসিক তথ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবুও সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পুস্তকটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

কাজী দীন মুহম্মদ
পরিচালক : বাংলা একাডেমী।

স্নেহের বোন

আয়েশা খাতুনকে—

অনুবাদকের অন্যান্য প্রকাশিতব্য গ্রন্থ :

প্রবন্ধ পল্লী

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্রাবলী (অনুবাদ)

আরব্যোপন্যাস (অনুবাদ)

বাংলা অনুবাদকের কথা

বাংগালী মুসলমানদের পরিচয় কি, তারা কি বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর, না এদেশেরই ধর্মান্তরিত হিন্দু পূর্বপুরুষদের বংশধর, এ নিয়ে বিতর্কের অবসান আজো হয়নি। মুর্শিদাবাদের নওয়াব বাহাদুরের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বি সাহেবই সর্বপ্রথম এ সম্পর্কে পূর্ণাংগ আলোচনা করেন তাঁর 'হকিকতে মুসলমান-ই বাংগালা' নামক ফার্সি গ্রন্থে। বেভার্লি, রিজলি, হান্টার প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিত তাঁদের গ্রন্থাবলীতে বাংলার মুসলমানকে নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু থেকে উদ্ভূত বলে যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন, ফজলে রাব্বি সাহেব বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ও সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে নানা তথ্য উপস্থিত করে সেগুলি খণ্ডন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে অধিকাংশ বাংগালী মুসলমানদের পূর্বপুরুষ ছিলেন আরব, তুরস্ক, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে আগত মুসলমান। তাঁর এ মতের সমর্থনে তিনি বহু জোরালো যুক্তিও দেখিয়েছেন। তাছাড়া বহু মূল্যবান তথ্যের সাহায্যে তিনি বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাধিক্যের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন।

দেওয়ান ফজলে রাব্বি সাহেব তাঁর গ্রন্থখানির বহুল প্রচারের এবং বাংগালী মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে ইংরেজ

সরকারে ও ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে নিজেই এর ইংরেজী অনুবাদ করেন এবং এর নাম দেন The Origin of the Musalmans of Bengal. বাংলা একাডেমী এ ধরনের গ্রন্থ অনুবাদের পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এদেশে গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য বিধায় আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে বাংলা একাডেমীর অনুবাদ বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন বৃটিশ মিউজিয়াম কিংবা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে উক্ত গ্রন্থখানি নকল করে আনার জন্যে আমাকে পত্র লেখেন। আমি বৃটিশ মিউজিয়ামের ক্যাটালগ ঘেঁটে গ্রন্থটির সন্ধান পাই এবং নকল করে এনে নিজেই এর অনুবাদ করি।

একথা সত্যি যে ইতিহাসে বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসে অভিজ্ঞ কোনো অধ্যাপক কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তি এ গ্রন্থখানা অনুবাদ করলে কম ত্রুটিপূর্ণ হতো। আমার এ অনুবাদ যে ত্রুটিমুক্ত হয়নি তা অকপটে স্বীকার করছি। বিশেষ বিশেষ ফার্সি বা বিদেশী শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি নবাগত বলে পাঠকগণ সহানুভূতির সহিত আমার ত্রুটিগুলি ক্ষমার চোখে দেখবেন বলে আশা করি।

পরিশেষে আমার অগ্রজ তুল্য জনাব সরদার ফজলুল করিম ও বন্ধুবর গোলাম সামদানী কোরায়শীর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—যাঁদেরকে অনুবাদের ব্যাপারে মাঝে মাঝে বিরক্ত করেছি।

মুঃ আবদুর রাজ্জাক

সূচীপত্র

পূর্বকথা

ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রদেশ বা অঞ্চল থেকে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা অধিক বলে বাংগালী মুসলমানদের এই সংখ্যাধিক্যের কারণ এবং তাদের উৎপত্তি সম্পর্কে অনুসন্ধানের কিছু প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার মতো কোনো পুস্তক অদ্যাবধি প্রকাশিত না হওয়ায় সঠিক তথ্যের অভাবে অনুসন্ধানী লোকেরা সাধারণতঃ উল্লিখিত বিষয়ে ভ্রান্তিপূর্ণ মত গঠনে তৎপর হন এবং নিজেদের কল্পনা শক্তির ভিত্তিতে অনুমিত ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেন।

কাজেই আমি বাংলার ইতিহাস ও ঘটনাপঞ্জীর পাতায় পাতায় সযত্ন অনুসন্ধানে ব্রতী হয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ করেছি এবং এভাবে আমি এ গ্রন্থ রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছি। উপরোক্ত উৎস ছাড়াও অন্যান্য উৎস থেকে আমার সাধ্যমতো আরো অনেক তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলির সবই আমি এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সংক্ষিপ্তাকারে সন্নিবিষ্ট করেছি এবং এর নাম দিয়েছি ('হকিকতে মুসলমান-ই-বাংগালা') কিংবা 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস্ অব বেংগল' এ গ্রন্থের মধ্যে যদি পাঠকদের কেউ কোনো ভুলের সন্ধান পান তাহলে তাঁরা উদারতার সংগে সেজন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার অনুরোধ ভবিষ্যতে এর সংশোধনের জন্যে পাঠকগণ এ ভুলগুলিকে লেখকের গোচরে আনবেন।

এ গ্রন্থ রচনার অগ্রগতিতে আমার কনিষ্ঠ ভাই খন্দকার আলী হায়দার এবং আমার বন্ধু ও দিল্লীর অধিবাসী মির্যা ফররুখ সাহেবের মূল্যবান সাহায্য দানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তাছাড়া 'Priceless Pearls' ও 'Lament of Islam' গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা মৌলবি অলকদরি সৈয়দ হাসিবুল হুসেন বি. এ সাহেবের নিকটও জানাচ্ছি আমার কৃতজ্ঞতা, যিনি এ গ্রন্থের অনুবাদে আমাকে মূল্যবান সাহায্য দান করেছেন।

খন্দকার ফজলে রাব্বি
মুর্শিদাবাদ।

সূচনা

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বাংলা প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ২৩৬৫৮৩৪৭ জন। এই মোট সংখ্যার মধ্যে মূল বাংলায় ১৯৫৭৭৪৩১, বিহারে ৩৫০৪৪৮০, উড়িষ্যায় ৯২৪৬৮, ছোট নাগপুরে ২৫৭৮০৯ এবং বাংলা সরকারের অধীনস্থ করদ রাজ্যগুলিতে (যথা— কোচবিহার, উড়িষ্যার কতিপয় পার্বত্য অঞ্চল ও দেশীয় রাজ্য এবং ছোট নাগপুর) ১৮৩৬৭০ জন মুসলমান ছিলো।

১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে সরকারী হিসাব মতে ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানের সংখ্যা ছিলো পাঁচ কোটি। এই মোট সংখ্যার মধ্যে অর্ধেকের কিছু কম অর্থাৎ ২৩৬৫৮৩৪৭ জন মুসলমান ছিলো বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় এবং ১৯৫৭৭৭৮১ জন ছিলো মূল বাংলায়। এরূপে মূল বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা ভারতবর্ষের সমস্ত মুসলমানের এক তৃতীয়াংশ ছিলো।

বাংলার কয়েকটি বিভাগ ও জেলার বসবাসকারী মুসলমানদের সংখ্যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারের রিপোর্ট মোতাবেক বাংগালী মুসলমানদের বিস্তারিত বিবরণ

বিভাগ	জেলা	প্রতিটি জেলার মুসলমানদের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
বর্ধমান	বর্ধমান	২৬৭২১৪	৯৯৯ ৯১
	বাঁকুড়া	৪৫৩১২	
	বীরভূম	১৬৯৭৫২	
	মেদিনীপুর	১৭১৪১২	
	হুগলী	১৯২৬৮৫	
	হাওড়া	১৫২৮০৬	
প্রেসিডেন্সী	২৪ পরগণা	৬৯০৮১৫	৪২১৪১৬১
	কলিকাতা	২০৩১৭৬	
	নদিয়া	৯৪৭৩৯০	
	যশোহর	১১৫০১৩৫	
	মুর্শিদাবাদ	৬১৮৫৫৩	
	খুলনা	৬০৩৯২৫	
রাজশাহী	দিনাজপুর	৮০২৫৯৭	৫০২৫৩৩০
	রাজশাহী	১০৩৩৯২৭	
	রংপুর	১২৯৫৪১১	
	বগুড়া	৬৬১১০০	
	পাবনা	৯৯৯৮০৩	
	দার্জিলিং	১০০১১	
	জলপাইগুড়ি	২২২৪৭২	

বিভাগ	জেলা	প্রতিটি জেলার মুসলমানদের সংখ্যা	মোট সংখ্যা
ঢাকা	ঢাকা	১৪৭৩৭৯৯	৬৪২৯০১৭
	ফরিদপুর	১০৯৬০৩০	
	বাখরগঞ্জ	১৪৬২৭১২	
	ময়মনসিংহ	২৩৯৬৪৭৬	
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৯২৪৮৪৯	২৯০৯৭৮২
	নোয়াখালী	৭৬০৫৯৭	
	ত্রিপুরা	১২২৪৩৯৬	
পাটনা	পাটনা	২০১০৮৬	১৮০৬১২২
	গয়া	২২৬৩০৫	
	শাহাবাদ	১৪৮৪৫৯	
	দ্বারভাংগা	৩৩৮৬৬৭	
	মোজফ্ফরপুর	৩১২৮৭৩	
	সরণ	২৯১০১৩	
	চম্পারণ	২৬৭৩১৯	
	ভাগলপুর	১৯৫৫৯১	১৬৯৮৬৬৫
	মুংগের	১৯১৭৭০	
	পুর্ণিয়া	৮০৫২৬৭	
	মালদহ	৩৮৪৬৫১	
	সাঁওতাল পরগণা	১২১০৮৬	

মূল বাংলা ... ১৯৫৭৭৪৮১[১]
বিহার ... ৩৫০৪৪৮৭
উড়িষ্যা ... ৯২৯৯৬
ছোট নাগপুর ২৫৭৮০৯
কোচবিহার ১৭০৭৪৬

		সর্বমোট
উড়িষ্যা করদরাজ্য সমূহ	৬১৯১	২৩৬৫৮৩৪৭
ছোট নাগপুর করদরাজ্য সমূহ	৬৭০৩	

উপরোল্লিখিত তথ্য থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, মূল বাংলায় মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা রয়েছে। বাংলা সরকারের সদ্য প্রকাশিত শাসন সংক্রান্ত রিপোর্টে আমি দেখেছি যে বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা সেখানে ১৯৫৮২,৩৭৯ জন, হিন্দুদের সংখ্যা সেখানে ১৮০৬৮৬৫৫ জন অর্থাৎ মুসলমানদের পক্ষে রয়েছে পনেরো লক্ষেরও বেশী লোকের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা। বিহারে রয়েছে হিন্দুদের বিরাট সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, মুসলমানদের চাইতে ছয় গুণেরও বেশী; আবার উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরে মুসলমানদের সংখ্যা সেখানকার জনসমষ্টির একটা ভগ্নাংশ মাত্র। যে সমস্ত কারণে উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে পারেনি, পশ্চিম বংগে মুসলমানদের সংখ্যা লঘিষ্ঠতার পেছনেও সেই

১ বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী—এই বিভাগগুলিসহ।

কারণগুলিই কার্যকরী হয়েছে। পশ্চিম বংগে এ দুটি বৃহৎ জাতির লোক সংখ্যা আমরা নিম্নরূপ দেখতে পাই—

হিন্দু ... ৬৩৯৯৯২৯
মুসলমান ... ৯৯৯১৯১

তিনটি প্রদেশকে একত্রে ধরলে আমরা দেখতে পাই যে বিহার ও উড়িষ্যায় এবং ছোট নাগপুর ও পশ্চিম বংগের জেলাগুলিতে মাত্র পাঁচ মিলিয়নের মতো মুসলমান রয়েছে, যেখানে হিন্দুর সংখ্যা বত্রিশ মিলিয়ন। কিন্তু মধ্য ও পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অনেক বেশী। মহামান্য ছোট লাট বাহাদুর কর্তৃক শাসিত সমগ্র অঞ্চলের লোক সংখ্যা এভাবে বিভক্ত হয়েছে—

হিন্দু ... ৪৫২১৭৬১৮
মুসলমান ... ২০৬৫৮০৪৭

মধ্য ও পূর্ব বাংলা প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই চারটি বিভাগ নিয়ে গঠিত কিংবা চারটি কমিশনারের শাসনাধীন এবং এখানকার লোক সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত—

মুসলমান ... ১৮৫৮৭১৫৮
হিন্দু ... ১১৬৬৮৬৮৬

বাংলার মুসলমানদের সংখ্যা এতো বেশী কেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে এবং তাদের উৎপত্তি, যেমন—তাদের পূর্ব পুরুষগণ এ দেশীয় হিন্দু কিনা, যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে কিংবা তারা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের বংশধর কিনা, যারা এদেশে আগমন করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে ইত্যাদি নিরূপণ করতে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন ; যথা (১) ইতিহাস কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণ, (২) মুসলমানদের বিভিন্ন লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ; (৩) এই মুসলমানদের নৃকুলতত্ত্ব বিষয়ক মুখাবয়ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং (৪) তাদের পরিবারগুলির বিস্তারিত বিবরণ

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রমাণ

'তারিখ-ই-ফিরিশতা'র সপ্তম অধ্যায়ে এ কথার উল্লেখ আছে যে হিজরি ৬০০ সালে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তখনকার ভারত সম্রাট কুতুব উদ্দীন আইবেকের নির্দেশে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলায় সর্বপ্রথম মুসলমান বিজয় সংঘটিত হয়।

বখতিয়ার খিলজি ছিলেন ঘোর রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত আমির। সুলতান গিয়াস উদ্দীন মোহাম্মদ সাম-এর রাজত্বকালে তিনি গজনি আগমন করেন; সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হন এবং সুলতান শাহাবুদ্দীনের অন্যতম উচ্চপদস্থ আমির মালিক মোয়াযযম হিশাম উদ্দীনের সংস্পর্শে আসেন। এই সম্ভ্রান্ত আমিরের প্রভাবের জন্যে তিনি দোয়াবায় কিছু পরগণা জায়গির স্বরূপ লাভ করেন। তাছাড়া তাঁর শৌর্য ও শক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে কম্বিলা ও বেতালির জায়গির দান করা হয়। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী, উদার ও পরিণামদর্শী। তিনি বিহারের দাংগাবাজ ও উদ্ধত সর্দারদের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযান চালনায় রত ছিলেন এবং প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও ধনসম্পদ হস্তগত করেন। এভাবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আড়ম্বরপূর্ণ ও উচ্চস্তরের জীবনযাপনের উপযোগী ধন-সম্পদের অধিকারী হন।

নিজেদের দেশের বিপ্লবের জন্যে প্রাচীন ঘোর, গজনি ও খোরাসানের অনেক অধিবাসীই স্বদেশ পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষে আগমন করতো এবং পর্যটকের জীবন গ্রহণ করতো ; মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির সাহসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার কথা অবগত হয়ে তারা তাঁর নিকট সমবেত হতো। এই ভাগ্যান্বেষীরা বখতিয়ার খিলজির শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে বহুল পরিমাণে সাহায্য করেছিলো। তখনকার দিল্লীর সম্রাট কুতুব উদ্দীন আইবেক এ সমস্ত ঘটনার সংবাদ পেয়ে বখতিয়ার খিলজির আচরণ অনুমোদনের প্রতীক স্বরূপ তাঁর নিকট খেলাত (সম্মান-সূচক পোশাক ও অন্যান্য উপহার) পাঠান। এই রাজকীয় অনুগ্রহ তাঁর হস্তকে আরো শক্তিশালী করলো। তিনি তখন সমগ্র বিহারের ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করলেন, সেই রাজ্যের হিন্দু শক্তির সমস্ত নিদর্শন মুছে ফেললেন এবং সেখানে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। ১১০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বংগদেশ আক্রমণ করেন এবং রাঢ় ও বরেন্দ্র নামে পরিচিত ভূভাগ দখল করেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা তিন ভাগে বিভক্ত ছিলো ; যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র ও বংগদেশ। মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি যখন বাংলা জয় করেন তখন এর শাসক ছিলেন লক্ষণ রায়, নদিয়া শহর ছিলো তাঁর রাজধানী। লক্ষণাবতীসহ এই শহর ছিলো রাঢ়ে অবস্থিত। এ সম্পর্কে 'তবাকা'ত-ই-নাসিরি' গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে :

> গংগা নদীর দুই পার্শ্বে লক্ষণাবতী রাজ্যের দুটি শাখা ছিলো। পশ্চিম দিকের শাখাকে বলা হতো রাঢ় এবং লক্ষণাবতী শহর এই শাখায় অবস্থিত ; পূর্ব দিকের শাখাকে বলা হতো বরেন্দ্র বা বরেন্দাহ্, এবং দেওকোট শহর ছিলো এর অন্তর্ভুক্ত।

'ফিরিশতা'-তে বর্ণিত আছে যে রাজা লক্ষ্মণের সরকারী কর্মস্থল ছিলো নদিয়ায়, যা লক্ষণাবতী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। 'তবাকাত-ই নাসিরি' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে কিছু সংখ্যক জ্যোতিষী ও ব্রাহ্মণ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন যে, তাঁদের প্রাচীন ঋষিদের পুস্তকে একথা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে এ দেশ তুর্কীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) হস্তগত হবে এবং সে সময় যখন আসবে তখন ক্ষমতাসীন রাজা তাদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করলেন, যাতে রাজ্যের অধিবাসিগণ মুসলমানদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে পারে।

রাজা জ্যোতিষীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁদের প্রাচীন ঋষিদের গ্রন্থে মুসলমান সেনাবাহিনীর অধিনায়কের পরিচয়মূলক কোনো লক্ষণের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে কিনা, যার সাহায্যে সে সম্পর্কে একটা নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে। জবাবে তাঁরা বললেন যে, উক্ত সেনানায়কের নিদর্শন হবে এই যে যখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবেন এবং হাত দুটি তাঁর উভয় পার্শ্বে নামিয়ে রাখবেন তখন তাঁর আংগুলগুলি তাঁর হাঁটুর সন্ধিস্থলকে ছাড়িয়ে যাবে। এ ধরনের জবাব পেয়ে রাজা লক্ষণ এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে দেখার জন্যে কয়েকজন বিশ্বস্ত লোককে নানাদিকে পাঠালেন; অনুসন্ধানের পর তারা দেখতে পেলো যে, জ্যোতিষিগণ রাজার নিকট যে বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করেছিলেন সেগুলি মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তারা রাজাকে এ সংবাদ দিলো। সংবাদটি দেশের ব্রাহ্মণ ও বুদ্ধি-জীবী, সর্দার ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করলো; তাঁদের সকলেই কালবিলম্ব না করে জগন্নাথ, কামরূপ এবং অন্যান্য দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন, যা তাঁদের

নিকট নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলো। পরিশেষে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্ভব হলো তাদের সকলেই নিজেদের বাড়িঘর ত্যাগ করে অন্যান্য প্রদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করলো। ব্রাহ্মণদের মতো নিজের পৈত্রিক রাজ্য এবং গৃহ পরিত্যাগ করার ধারণা রাজার নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বিহার থেকে অভিযান করে তাঁর রাজধানী নদিয়ায় আগমন এবং প্রাসাদের কটকে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তিনি গড়িমসি করে তাঁর রাজধানীতেই অবস্থান করতে লাগলেন। মুসলমানেরা যখন তাঁর প্রাসাদের কটকে পৌঁছলো, তখন তিনি তাঁর রাজ্য ছেড়ে বংগ দেশের বিক্রমপুরের দিকে পলায়ন করেন মোহাম্মদ বখতিয়ার পরে লক্ষণাবতী ও অন্যান্য রাজ্য জয় করে তাঁর নিজের নামে 'খোৎবা' পাঠের প্রচলন করেন এবং মুদ্রাঙ্কন করেন। যে সমস্ত মুসলমান তাঁর সংগে এসেছিলো এবং সময় সময় যে মুসলমানেরা এসে তাঁর সংগে মিলিত হয়েছিলো, তিনি তাদের সকলকেই তাঁর নতুন বিজিত রাজ্যে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন।[১]

স্যার ডব্লিউ. হান্টার তাঁর Statistical Accounts of Dacca নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে বরেন্দ্র ও রাঢ় প্রদেশগুলি ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানদের কর্তৃক বিজিত হয় এবং বংগদেশ নামে অভিহিত পশ্চিমাঞ্চলটি মোহাম্মদ তোঘলক শাহ্ কর্তৃক বিজিত হয়। তিনি যথাক্রমে গৌড়, সাতগাঁ ও সোনারগাঁ তাঁর প্রশাসনিক কর্মস্থলে পরিণত করেন।

১ মালিক বখতিয়ার কসবা দেওগড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং সে জেলায় তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিষ্কর ভূমি দান করেন। —সুবাহ বিহারের ইতিহাস থেকে

ঐ সময় থেকে অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলার প্রথম মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো এবং এদেশ মুসলমান অধিবাসীদের [১] দ্বারা পূর্ণ হতে লাগলো ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ৫৬০ বছর সময়কালের জন্যে এদেশে মুসলমানদের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত গতিতে বজায় ছিলো।

---

১ ডক্টর বুকানন মনে করেন যে বাংলার হিন্দু যুবরাজগণ তাঁদের রাজ্যের পশ্চিমাংশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বহুকাল পরেও সোনার্গাঁয়ে তাঁদের শাসন পরিচালনা করেছিলেন এবং ফরিদ উদ্দীন সুর শেরশাহের সময় পর্যন্ত প্রদেশের এ অংশ মুসলমান বিজেতাদের রাজ্যের সংগে সংযোজিত হয়নি।

কিন্তু একথা সুবিদিত যে শেরশাহের পূর্ববর্তীকালেও বাংলার পূর্বাংশে মুসলমান শাসক ছিলেন এবং ১২৭৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব থেকেই সোনারগাঁ তাঁদের অধীনে ছিলো। বস্তুতঃ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক এদেশ বিজয়ের বহু আগেও বাংলার এই অংশে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকা বিচিত্র নয়। আমরা জ্ঞাত হয়েছি যে, বসরা'র আরব বণিকগণ আট শতক কিংবা তার পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ও চীনের সংগে ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো। বাণিজ্য উপলক্ষে তারা যেসব দেশে গিয়েছে, তাদের অনেকেই সেসব দেশে বসতি স্থাপন করেছে। প্রাচ্যের সেই সময়কার মুসলমান বণিকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর রবার্টসন বলেছেন: 'ক্যান্টন সহরে তারা সংখ্যায় এতো বেশী ছিলো যে সম্রাট (আরব দেশীয় লেখকদের বর্ণনানুযায়ী) তাদেরকে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে কাজি বা বিচারক নিযুক্ত করার অনুমতি দিয়েছিলেন; এই কাজি তাঁর দেশবাসীদের মধ্যেকার বিরোধ তাদের নিজস্ব আইনের সাহায্যে নিষ্পত্তি করতেন এবং সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতেন। অন্যান্য স্থানে

মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির শাসনকাল থেকে কদর খানের শাসনকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাংলা দিল্লী সম্রাটের শাসনাধীন ছিলো। এই সময়ের মধ্যে দিল্লীর সম্রাট বাংলা শাসনের জন্য ভাইসরয় নিযুক্ত করতেন। কিন্তু ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফখরুদ্দীনের অধীনে বাংলা একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। সুলতান ফখরুদ্দীন চূড়ান্ত ক্ষমতা অধিকার করেন এবং নিজেকে একটি স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের নিকট বাংলার শাসক দাউদ খানের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত এদেশ তার পূর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলো।

ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষা নিতো এবং প্রায় প্রতিটি সামুদ্রিক বন্দরে আরবী ভাষা বোধগম্য ছিলো ও এ ভাষায় কথাবার্তা চলতো' (রবার্টসনের Ancient India, পৃঃ ১০২ দ্রষ্টব্য)। এ ঘটনা থেকে বিশ্বাস করার হেতু রয়েছে যে এই প্রাথমিক যুগে বাংলা ছিলো মুসলমান বণিকদের উপনিবেশ ভূমি প্রাচীনকাল থেকে এদেশ পাশ্চাত্য দেশগুলির সংগে ব্যাপকভাবে যে বাণিজ্য চালাতো, এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যে খুব বেশী ছিলো এবং সর্বোপরি নয় শতকের দু'জন মুসলমান পর্যটক এদেশ সম্পর্কে যে স্পষ্ট মন্তব্য করে গেছেন তা থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। তাঁরা এই ভূভাগকে উল্লেখ করেছেন 'রাখি নামক রাজার দেশ হিসেবে যাঁর অধিকারে বহু সংখ্যক হাতী ছিলো। এর প্রধান রপ্তানী দ্রব্য ছিলো সূতীবস্ত্র (ঢাকাই মসলিন), সুন্দকুমারী কাঠ (অগুরু কাঠ), নতুন জাতীয় প্রাণীর চামড়া (ভোঁদড়ের চামড়া) এবং গণ্ডারের শিং, যেগুলির সবগুলিই শঙ্খের (কড়ির) বিনিময়ে কেনা হতো, যা ছিলো এদেশের প্রচলিত মুদ্রা'।' —এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যার ৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ সময় থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলার দেওয়ানি লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা দেশ দিল্লীর সম্রাটদের কর্তৃত্বাধীনে ছিলো এবং দিল্লীর রাজদরবার বাংলার নাযিম নিযুক্ত করতো। কিন্তু এই অন্তর্বর্তী কালের মধ্যেও দিল্লীর সম্রাট মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে ইরানের বাদশাহ নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করলে তখনকার বাংলার সুবাদার সুজা খান দিল্লীর প্রতি তাঁর আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করেন এবং স্বাধীনতা লাভ করেন। এদেশ ইংরেজদের হস্তগত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার এই স্বাধীনতা বজায় ছিলো।

এই ৫৬১ বছর সময়কাল অর্থাৎ এদেশে মুসলমান বিজেতাদের আগমন থেকে ইংরেজদের শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে দিল্লীতে কয়েকটি মুসলমান রাজবংশ তাঁদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথম পর্যায়ে (যখন মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলা জয় করেন) এদেশ শাসন করেন ঘোরি রাজবংশ, যা কায়কোবাদের রাজত্বকালে লোপ পেয়ে যায়। ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে খিলজি রাজবংশ পূর্বোক্ত রাজবংশের উত্তরাধিকারী হন, আবার ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের স্থানে অধিকার করেন তুঘলক রাজবংশ। এই বংশ ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত শাসনকার্য চালান এবং তাঁদের পর সৈয়দ রাজবংশ এদেশের শাসনক্ষমতার অধিকারী হন। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মুগল রাজবংশ বা তৈমুরের বংশধরগণ সৈয়দ রাজবংশের স্থলাভিষিক্ত হন

পর পৃষ্ঠায় বাংলার সুবাদার, রাজা ও নাযিমদের এবং সেইসংগে দিল্লীর সম্রাটদেরও একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রদত্ত হলো।

বাংলার সুবাদার, স্বাধীন রাজা ও নাযিমদের এবং দিল্লীর সম্রাটদেরও একটি কালানুক্রমিক তালিকা :

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১২০৩	৬০০	মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজি (তিনি গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন)।	কুতুবউদ্দীন আইবেক
১২০৫	৬০২	মোহাম্মদ শিবিন, আয়েযউদ্দীন খিলজির নাম ধারণ করে ছিলেন।	কুতুবউদ্দীন আইবেক
১২০৮	৬০৫	আলি মর্দান খান খিলজি	ঐ
১২১১	৬০৯	হিশামউদ্দীন হোসাইন, সুলতান গিয়াসউদ্দীন খিলজি নাম ধারণ করেছিলেন। তাঁর নিজের নামে খোৎবা পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং লক্ষ্ণাবতী রাজ্যে তাঁর নিজের নামে মুদ্রাঙ্কন করেছিলেন।	আরাম শাহ, কুতুবউদ্দীন আইবেকের পুত্র
১২২৭	৬২৪	নাসিরউদ্দীন শাহ, সুলতান শামসুদ্দীন আলত মাসের পুত্র	শামসুদ্দীন আলতমাশ
১২২৯	৬২৭	ইয্‌যত্‌-উল-মুলক মালিক আলাউদ্দীন খান	ঐ

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১২৩৭	৬৩৫	আযিযউদ্দীন তোগ্রা খান	সুলতানা রাজিয়া, শামসুদ্দীন আলতমাসের কন্যা
১২৪৪	৬৪২	মালিক কারা বেগ তিমুর খান	বাহরাম শাহ, শামসুদ্দীন আলতমাসের পুত্র
১২৪৬	৬৪৪	মালিক সাইফউদ্দীন	সুলতান নাসিরউদ্দীন মাহমুদ, শামসুদ্দীন আলতমাসের পুত্র
১২৫৩	৬৫১	মালিক উযবেক	ঐ
১২৫৭	৬৫৬	মালিক জালালউদ্দীন	ঐ
১২৫৮	৬৫৭	আরসালান খান	ঐ
১২৬০	৬৫৯	তাতার খান, আরসালান খানের পুত্র	ঐ
১২৭৭	৬৭৬	তুঘ্রল	সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন

চেংগিস খানের মুগলবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বৃদ্ধ সুলতান গিয়াসউদ্দীনের ধনসম্পদ নিঃশেষিত হওয়ার পর উদার ও বিচক্ষণ তুঘ্রল তাঁর নিজের অবস্থাকে শক্তিশালী করেন এবং স্বাধীনতা লাভ করে তাঁর নিজের নামে সোনা পাঠের প্রচলন করেন

এই ঘটনার পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন স্বয়ং বাংলাদেশ আক্রমণ করেন এবং তুঘ্রলকে হত্যা করে এ রাজ্যের ভার তদীয় পুত্র

বোঘরা খানের ওপর ন্যস্ত করেন। সে সময়ে যে সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য পাওয়া গিয়েছিল সেগুলির প্রায় সবই তিনি বোঘরা খানকে দান করেন ; কেবল প্রজননোপযোগী হস্তী ও ধনরত্নাদি নিজের জন্যে নিয়ে যান তিনি তাঁর পুত্রের মস্তকোপরি রাজকীয় ছত্র স্থাপন করেন, যাঁর নামে তিনি খোৎবা পাঠের প্রচলন করেন এবং মুদ্রাঙ্কন করেন তিনি বিদায়কালে তাঁর পুত্রকে নিম্নোক্ত উপদেশ দান করে যান—(১) লক্ষ্ণাবতীর শাসনকর্তাকে দিল্লীর সম্রাটের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা চলবে না, তা সেই শাসনকর্তা সম্রাট পরিবারেরই হোন কিংবা অন্য যে কোন পরিবারেরই হোন, দিল্লীর সম্রাট যখন লক্ষ্ণাবতীর ওপর দিয়ে অগ্রসর হবেন তখন এর শাসনকর্তাকে কোন নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে ; এবং সম্রাট যখন এদেশ ত্যাগ করবেন তখন তিনি তাঁর নিজের রাজ্যে ফিরে আসবেন এবং স্বীয় প্রজাদের উন্নতি-বিধানে আত্মনিয়োগ করবেন (২) স্বীয় প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তাঁকে ধৈর্যশীল ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে ; অর্থাৎ তাঁকে এতো অল্প রাজস্ব ধার্য করা চলবে না যাতে অনমনীয় করদাতাগণ দ্বিধা করতে সাহসী হয় ; কিংবা তিনি এতো অধিক রাজস্ব দাবি করবেন না যাতে প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। এক কথায় তিনি এমন রাজস্ব ধার্য করবেন যা পরিশোধ করতে জনসাধারণকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে না হয় (৩) বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ পরিষদ সদস্যদের পরামর্শ ব্যতীত কোনো সরকারী কর্মপন্থা গ্রহণ করা চলবে না। (৪) মিলিশিয়া বাহিনীকে উপেক্ষা করা চলবে না (৫) যেসমস্ত সংসারত্যাগী লোক আল্লার কাজে নিযুক্ত, তাদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেয়া চলবে না। এভাবে পরামর্শ দান করে গিয়াসউদ্দীন

বলবন বাংলা শাসনের জন্য তাঁর পুত্রকে রেখে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ৬৮৬ হিজরিতে এই সম্রাটের মৃত্যুর পর দিল্লীর দরবারের আমিরগণ সুলতান নাসিরউদ্দীনের পুত্র কায়কোবাদকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। ৬৮৮ হিজরিতে সুলতান জালালউদ্দীন ফিরোয শাহ নামক দিল্লীর দরবারের একজন উচ্চপদস্থ আমির কায়কোবাদকে হত্যা করে অন্যায়রূপে সিংহাসন অধিকার করেন। ঐ সময় থেকে দিল্লী সাম্রাজ্য ঘোরি রাজবংশের হাত থেকে খিলজি রাজবংশের হাতে চলে যায়। তথাপি বাংলায় বোঘরা খানের রাজত্বকাল ৭২৫ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী ছিলো। তাঁর রাজত্বকালের মধ্যে পর পর কয়েকজন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, যথা (১) জালালউদ্দীন ফিরোয শাহ খিলজি; (২) আলাউদ্দীন খিলজি; (৩) আলাউদ্দীনের পুত্র শাহাবুদ্দীন; (৪) সুলতান কুতুবউদ্দীন মোবারক শাহ খিলজি, (৫) সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ এবং (৬) মোহাম্মদ তুঘলক শাহ। বোঘরা খান বাংলায় চুয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সান	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১২৮২	৬৮১	বোঘরা খান, সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র; তিনি সুলতান নাসিরউদ্দীন নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন
১৩২৫	৭২৫	মালিক বেদার খিলজি, কদর খান নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক, সুলতান গিয়াসউদ্দীনের পুত্র

সুলতান নাসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক কদর খানকে লক্ষণাবতীর সিংহাসনে বসান।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৪০	৭৪১	সুলতান ফখরউদ্দীন	সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক।

সুলতান মোহাম্মদ তুঘলকের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার জন্যে এবং বারংবার দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার ফলে দিল্লী সাম্রাজ্য দুর্বল এবং অংগহানি হওয়ার সুযোগে মালিক ফখরউদ্দীন নামক কদর খানের একজন আমির তাঁকে হত্যা করে সুলতান ফকরউদ্দীন নাম ধারণ করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৪৩	৭৪৪	হাজি ইলিয়াস, সুলতান শামসউদ্দীন তাঁরা নাম ধারণ করেছিলেন।	সুলতান মোহাম্মদ তুঘলক

ফখরউদ্দীন আলী মোবারক কর্তৃক নিহত হন। এই আলী মোবারক মাত্র অল্প সময়ের জন্য সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, কিন্তু পর্যায়ক্রমে তিনিও হাজি ইলিয়াসের হাতে নিহত হন, হাজি ইলিয়াস সে রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি আলী মোবারককে হত্যা করে সুলতান শামসউদ্দীন নাম ধারণ করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন এবং বাংলায় একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দূরদর্শী শাসনাধীনে এদেশ

যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এহেন উন্নতির মূলে আরো একটি কারণ সক্রিয় ছিলো। সে সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকায় বহু সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত পরিবার দেশ ত্যাগ করে বাংলায় এসে বসবাস করতে থাকেন। হাজি ইলিয়াসের শাসনকাল ছিলো দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ এবং তাঁর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৫৮	৭৬০	সুলতান সিকান্দর, শামসউদ্দীন ভাংরার পুত্র	সুলতান ফিরোয শাহ্ বারবক, সুলতান গিয়াস উদ্দীন তুঘলকের ভ্রাতুষ্পুত্র

বাংলায় এই রাজার শাসনকাল ছিলো আভ্যন্তরীণ শাসন ও বৈদেশিক সম্পর্ক—এই উভয় ক্ষেত্রেই শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৬৭	৭৬৯	সুলতান গিয়াসউদ্দীন, সুলতান সিকান্দরের পুত্র	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

সুলতান গিয়াসউদ্দীন ছিলেন একজন ধর্মীয় নীতিবান, ন্যায়-পরায়ণ ও সরল মেজাজের অধিকারী শাসক। তিনি ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়, শিক্ষিত ও ধার্মিক লোকদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিভিন্ন দেশের গুণবান ও প্রতিভাশালী লোকদেরকে নিমন্ত্রণ করে তাঁর রাজধানীতে এবং সিরাজনগরের প্রসিদ্ধ কবি হাফিযকে তাঁর লক্ষণাবতীর দরবারে আনার জন্যে দূত প্রেরণ করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৭৩	৭৭৫	সাইফ উদ্দীন, গিয়াস উদ্দীনের পুত্র ; তিনি সুলতান-উস্ সালাতিন খেতাব ধারণ করেছিলেন।	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

সুলতান গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর পর আমিরগণ সাইফ উদ্দীনকে সিংহাসনে বসান এবং তাঁকে সুলতান-উস্-সালাতিন খেতাব দান করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৮৩	৭৮৫	সুলতান শামস উদ্দীন, সুলতান-উস্-সালাতিনের পুত্র।	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

এই রাজা ছিলেন দয়ালু, উপকারী ও সাহসী। তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষদের সিংহাসনে বসে তাঁদের আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী রাজ্য শাসন করেন। তিনি বিশ্বাসঘাতক রাজা কংসের হাতে নিহত হন। রাজা কংস রাজ্যের একজন আমির ছিলেন। সুলতান শামসউদ্দীনকে নিহত করে তিনি বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

খ্রিস্টাব্দ	হিঃ সাল	বাংলার নাযিম	দিল্লীর সম্রাট
১৩৮৫	৭৮৭	রাজা কংস (গনেশ)	সুলতান ফিরোয শাহ বারবক

রাজা কংস মুসলমানদের প্রতি নৃশংস আচরণ করেন এবং ধার্মিক ও শিক্ষিত লোকদেরকে হত্যা করেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার

আযাদ উদ্-দৌলার মন্ত্রিত্বের আমলে এই আদেশ প্রচারিত হয়েছিলো যে যদি কোন 'সুয়ুরগাল' একাধিক লোকের অধিকারে থাকতো এবং ফরমানের শর্তানুযায়ী বিভক্ত না হতো, তা'হলে কোনো এক অংশীদারের মৃত্যু হলে 'সদর' স্বেচ্ছাপূর্বক 'সুয়ুরগাল'কে ন্যায্যভাবে ভাগ করতেন এবং মৃত অংশীদারের অংশ তার ন্যায্য উত্তরাধিকারীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী ভূমির অধিকারে রাখতেন। অধিকন্তু 'সদর'-কে পনেরো বিঘা পর্যন্ত ভূমির স্বত্বদান মঞ্জুর করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিলো।

পুনশ্চ, যখন একশত বিঘা বা তার কম ভূমির অধিকারী অসাধুতার অপরাধে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হতো তাহলে এই স্বত্বাধিকারীকে রাজার সম্মুখে উপস্থাপিত করার জন্যে 'সদর'-কে আদেশ দেয়া হতো। পরে এই মর্মে অতিরিক্ত আদেশ প্রচার করা হতো যে আবুল ফযলের সম্মতিক্রমে 'সদর' এই স্বত্বদানের পরিমাণ বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস করবেন।

সাধারণ নিয়ম ছিলো এই যে, অর্ধেক কর্ষিত ভূমি এবং বাকী অর্ধেক কর্ষণযোগ্য ভূমি সমন্বয়ে 'সুয়ুরগাল' গঠিত হতো। কিন্তু যদি এই নিয়মের ব্যতিক্রম হতো তাহলে সম্পূর্ণ 'সুয়ুরগাল'-এর এক চতুর্থাংশ হ্রাস করে বাকী অংশের পরিবর্তে নগদ টাকার একটি ভাতা দেয়া হতো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিবিঘার রাজস্বের হার বিভিন্ন রকমের হতো কিন্তু কখনো এক টাকার কম হতো না।[১]

মূলতঃ এ ধরনের নিয়ম ও সীমাবদ্ধতার অধীন, যা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে, বাংলার অধিকাংশ জেলার ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত লাখেরাজ কিংবা করমুক্ত রায়তিসত্বের প্রকারভেদ ও স্বরূপ পরপৃষ্ঠার লিখিত বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে।

---

১ আকবরের রাজত্বকালের 'সদর' সম্পর্কে টীকা

লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের প্রকারভেদ	স্বত্বাধিকারীর বিবরণ	রায়তি স্বত্বের প্রকৃতি
জায়গির	মুসলমান ও হিন্দু	কোনো দপ্তরের ব্যয় নির্বাহের জন্যে কিংবা চাকরির পারিশ্রমিক বাবদ স্বত্বাধিকারীর জীবৎকালের জন্যে প্রদত্ত।
আল-তমঘা	ঐ	স্থায়ীভাবে মঞ্জুরীকৃত ভূমিদান
মদদি-ম'আশ	মুসলমান	কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, সৈয়দ ও উচ্চ বংশজাত মুসলমানদেরকে প্রদত্ত।
আয়মা	ঐ	ধর্মীয় নেতা, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও সৈয়দদের জন্যে।
মসকান	ঐ	বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্যে।
নাযুরৎ	ঐ	আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, সৈয়দ এবং বয়োবৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ ধার্মিক লোকদের জন্যে।
খানকাহ্	ঐ	খানকাহ্ নির্মাণের জন্যে।
ফকিরান	ঐ	ভিক্ষাজীবীদের জন্যে।
নযরি দরগাহ্	ঐ	পবিত্র স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
নযরি ইমামাইন কিংবা তাযিয়া-দারি	ঐ	মুহরম উৎসব পালনের জন্যে।
যমিন-ই-মশজিদ	ঐ	মশজিদের চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্যে.

লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের প্রকারভেদ	স্বত্বাধিকারীর বিবরণ	রায়তি স্বত্বের প্রকৃতি
নযরি হযরত	মুসলমান	কোনো ধর্মানুষ্ঠানের জন্যে।
খরচি মুসাফিরান	ঐ	পথিকদের আতিথেয়তার জন্যে.
মেরামতি মসজিদ ইত্যাদি	ঐ	মশজিদ ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
মা-আ'ফি	ঐ	সদ্বংশজাত মুসলমানদের ভরণ-পোষণের জন্যে।
পিরান	ঐ	আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা, শিক্ষিত লোক ইত্যাদির জন্যে
খয়রাত কিংবা খয়রাতি	ঐ	নিঃস্ব অবস্থায় পতিত মুসলমান-দের জন্যে।
খারিজ জমা	হিন্দু ও মুসলমান	হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই এ রায়তি স্বত্বের অধিকারী
মিনহাই	ঐ	ঐ
ব্রাহ্মোত্তর	হিন্দু	বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের জন্যে।
মেহ্‌তেরান	ঐ	ব্রাহ্মণেতর হিন্দুদের জন্যে।
মালেক ও মালেকানা	মুসলমান ও হিন্দু	হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিই এর অধিকারী।
দেবোত্তর	হিন্দু	হিন্দুদের পবিত্র স্থানের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্যে।
শিবোত্তর	ঐ	ঐ

লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের প্রকারভেদ	স্বত্বাধিকারীর বিবরণ	রায়তি স্বত্বের প্রকৃতি
সুরজ্ঞ পর্বত	হিন্দু	হিন্দুদের পবিত্রস্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে।
ইনাম	মুসলমান ও হিন্দু	হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাজের পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত।
মানকর	ঐ	ঐ

ওপরের বিবরণে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের রায়তি স্বত্ব ছাড়াও বাংলা দেশে আরো অনেক ধরনের লাখেরাজ রায়তি স্বত্ব আছে, যা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। কিন্তু এ সমস্ত নামের মধ্যে আল-তমঘা, আয়মা, মদদি-ম'আশ ও জায়গির এই চারটি রায়তিস্বত্ব রাজপ্রদত্ত দান বোঝায়।

আয়মা রায়তিস্বত্ব কেবল বাংলাদেশেই প্রচলিত এবং তা আর কোথাও দেখা যাবে না। এর থেকে একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে এ দান কেবলমাত্র গৌড়ের রাজাদের দ্বারাই প্রদত্ত হতো।

'আয়মা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ জীবিকা বা ভরণপোষণ, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইহা রাজাদের প্রদত্ত জায়গির, বিশেষ করে অভাবগ্রস্ত ও বৃদ্ধ লোকদেরকে প্রদত্ত জায়গিরের অর্থই প্রকাশ করে। কেবলমাত্র সৈয়দ, ধার্মিক লোক, বয়োবৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ লোক ও মুসলমান ধর্মের নেতৃস্থানীয় লোকেরাই এ নামে পরিচিত দানের অধিকার ভোগ করতেন। কিংবা আরো মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, বাংলার রাজা মুসলমানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতাদেরকে যে ভূমি দান করতেন তাকেই আয়মা নামে অভিহিত করা হতো। আবার আয়মাকে দুটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে—একটি হলো কর-মুক্ত এবং অপরটি হলো খুব সামান্য পরিমাণে নির্ধারিত করের

আওতাভুক্ত. যাহোক, এ উভয় শ্রেণীর দানই সরকারের তরফ থেকে দেয়া হতো। নিষ্কর আয়মার অতি সামান্য অংশেরই অস্তিত্ব এখন আছে ; কারণ মোগল রাজবংশের শাসনামলে এর অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করে তারপর পূর্ব স্বত্বাধিকারীদের সংগেই নিম্ন হারে করের বিনিময়ে পুনরায় বন্দোবস্ত করা হতো। গৌড়ের রাজাদের এবং মোগল সম্রাটদের প্রদত্ত লাখেরাজ কিংবা নিষ্কর রায়তিস্বত্বের মধ্যে পার্থক্য কেবল নামমাত্র ; গৌড়ের রাজারা খোদাভক্ত, শিক্ষিত ব্যক্তি ও ধর্মীয় উপদেষ্টাকে যে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করতেন তা আয়মা নামে অভিহিত হতো ; অপরপক্ষে মোগল সম্রাটদের প্রদত্ত এই একই দান অভিহিত হতো মদদি ম'আশ নামে। আয়মা রায়তিস্বত্বের সন্ধান প্রধানতঃ সে সব জেলাতেই মিলবে, যেখানে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারবর্গ বাস করতেন। বাংলাদেশে এ ধরনের পঁচিশটি জেলা আছে। যথা :

১	মুর্শিদাবাদ	১০	বাঁকুড়া	১৮	ঢাকা
২	নদিয়া	১১	দিনাজপুর	১৯	ফরিদপুর
৩	২৪ পরগণা	২১	রাজশাহী	২০	বাখরগঞ্জ
৪	খুলনা	১৩	রংপুর	২১	ময়মনসিংহ
৫	যশোহর	১৪	বগুড়া	২২	চট্টগ্রাম
৬	বর্ধমান	১৫	পাবনা	২৩	নোয়াখালী
৭	হুগলী	১৬	দার্জিলিং	২৪	ত্রিপুরা
৮	মেদিনীপুর	১৭	জলপাইগুড়ি	২৫	মালদহ
৯	বীরভূম				

আবার, মুর্শিদাবাদ জেলায় আয়মার সংখ্যা হলো ৭০০ ; রাজশাহী, বাধা ও নাটোরে বহুসংখ্যক আয়মা রয়েছে ; বগুড়াতে

এর সংখ্যা হলো ৬৯৪ ; বর্ধমানে ১৭০৫ ; হুগলীতে ৮৯৩ ; বাখরগঞ্জে আয়মার সংখ্যা কিছু পরিমাণে কম, কিন্তু যথাযথভাবে নিরূপণ করা হয়নি। মেদিনীপুরে এর সংখ্যা হলো ১২, ২৪-পরগণায় ১৬ এবং মালদহ, দিনাজপুরে, নোয়াখালিতেও কিছু সংখ্যক আয়মা আছে, কিন্তু সেগুলির ঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। ওপরের হিসাব থেকে একথা সুস্পষ্ট যে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, মালদহ, রাজশাহী এবং বগুড়া জেলায় অর্থাৎ গৌড়ের আশেপাশের জেলাগুলিতে সর্বাধিক সংখ্যক আয়মা রয়েছে কিন্তু তথাপি এসমস্ত জেলায় আয়মাগুলি প্রধানতঃ উচ্চ ও আর্দ্রতামুক্ত অংশে পড়েছে, যেখানে জমি শক্ত ও দৃঢ় ; কিন্তু জলাভূমিবিশিষ্ট কিংবা বালুকাময় কিংবা নদী প্লাবনের ভয় থাকতে পারে এ ধরনের এলাকায় তা নেই বললেই চলে আবার, বাংলার তিনটি প্রাচীন উপবিভাগ, যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র ও বংগের মধ্যে রাঢ়েই বহুল পরিমাণে আয়মা দেখতে পাওয়া যাবে। বরেন্দ্রে আয়মার সংখ্যা রাঢ়ের চাইতে কম এবং বংগে কদাচিৎ দেখা যাবে

সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পর, রাজা তোডরমল যখন ভূমি-বন্দোবস্তের কাজ সমাপ্ত করেন, তখন সুযুরগালের ব্যবস্থাধীন অধিকাংশ আয়মা সরকারী ভূ-সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং পরবর্তীকালে নাযিম মুর্শিদকুলি খান ও নওয়াব কাশেম আলী খানের রাজত্বকালে আয়মা জমি পুনরায় সরকারের দখলে আসে এবং তারপর সেগুলি সামান্য করের বিনিময়ে আগের মালিকদের সংগে স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। তখন থেকেই এই সামান্য কর-নির্ধারিত সম্পত্তিগুলি আয়মা নামে অভিহিত হতে থাকে। আয়মা ভূমির জন্যে সরকারী রাজস্বের সাধারণ হার ছিলো তিন বিঘার জন্যে এক টাকা।

স্যার ডব্লিউ. হাণ্টার তাঁর Statistical Account of Murshidabad গ্রন্থে লিখেছেন যে, কর-নির্ধারিত আয়মা ও লাখেরাজের মধ্যে পার্থক্য ছিলো খুবই সামান্য। আয়মা কেবলমাত্র মুসলমানদেরকে দেয়া হতো; এবং যদিও তাদের নিকট থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো, তথাপি সেই রাজস্বের নির্দিষ্ট হার ছিলো খুবই কম এবং নামমাত্র। একই লেখক তাঁর রাজশাহীর বিবরণে লিখেছেন যে, এ জেলায় নাটোর ও বাঘায় আয়মা সম্পত্তি আছে। এসমস্ত আয়মা সম্পত্তি আগের শাসকদের কর্তৃক প্রধানত: মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিত লোক ও তাদের ধর্মপ্রাণ পবিত্র ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও ধর্মীয় নেতাদেরকে এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান-গুলিকে প্রদত্ত হতো। এ দানগুলি দেওয়ানি শাসনের বহুপূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছে; এবং এ দানসূত্রে অধিকৃত মালিকানাস্বত্ব ছিলো বংশগত ও হস্তান্তরযোগ্য দুই-ই।

আয়মা ব্যতীত মদদ-ই-ম'আশ ও অন্যান্য ধরনের যে সমস্ত লাখেরাজ রায়তি স্বত্বের কথা পূর্বের বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে, তা বাংলা দেশে প্রচুর আছে এবং যদিও এ গুলির ঠিক পরিমাণ জানা নেই, তথাপি পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে এর পরিমাণ খুবই বেশী।

এই প্রদেশগুলিতে যখন বৃটিশ জাতির সার্বভৌম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন এই বৃটিশ সরকারের ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সংখ্যক প্রবিধান অনুযায়ী দশ বিঘার অতিরিক্ত লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারীদের মধ্যে যারা রাজার 'সনদ' দাখিল করতে সমর্থ হয়নি তাদের রায়তি-স্বত্ব বাতিল হয়ে গিয়েছিলো। এই প্রবিধান কার্যকরী করার ফলে অনেক খাঁটি দানই, সনদ প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বলে, সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয়।

পরবর্তীকালে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩৭ সংখ্যক প্রবিধান পাস হয়। এ প্রবিধানের উদ্দেশ্য ছিলো রাজকীয় দান ব্যতীত আজীবন মেয়াদী ও অন্যান্য ধরনের লাখেরাজ রায়তি স্বত্ব সরকারী অধিকারে আনা। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব থেকে আরম্ভ হয়েছে বলে অনুমিত হয় এমন ধরনের সম্পত্তির দখলকারী সনদের অধিকারী হলেও এবং উক্ত সনের আগেই তারা ন্যায্য উপায়ে এর অধিকার অর্জন করলেও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচলিত রাজস্বের চাইতে অধিক হারে যার রাজস্ব ইতিপূর্বে নির্ধারিত হয়নি এমন ধরনের ভূমি পুনরুদ্ধারও এ প্রবিধানের উদ্দেশ্য ছিলো।

সবশেষে, লাখেরাজ ভূমি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রণীত ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের ২-সংখ্যক প্রবিধান এ সমস্ত রায়তি-স্বত্বের ওপর মরণ আঘাত হানে। এ প্রবিধানের ২৮ ধারায় একথা নির্দেশিত হয়েছে যে, খেতাবের জন্যে দিল্লীর সম্রাটের ফরমান, কিংবা কোনো উযির-নবাব বা রাজার কোনো সনদ অথবা পরোয়ানা বৈধ ভিত্তি বলে বিবেচিত হবে না, যে পর্যন্ত না অফিসের রেকর্ড থেকে এ ধরনের দলিলের যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয় এবং জীবিত সাক্ষীদের দ্বারা এগুলির অকৃত্রিমতা প্রমাণিত হয়; তাছাড়া অন্য প্রমাণ পত্রাদি লাখেরাজ সম্পত্তির পক্ষে থাকলেও কেবলমাত্র সে কারণেই তা বৈধ বলে স্বীকৃত হবে না।

ওপরে উল্লিখিত প্রবিধানগুলির বিশেষ করে শেষোক্ত বিধান-গুলির প্রয়োগের ফলে অধিকাংশ লাখেরাজ ভূ-সম্পত্তি সরকারী অধিকারের আওতায় আসে; এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই উচ্ছেদকারী আইন-প্রণয়ন ব্যবস্থা সত্ত্বেও এই প্রদেশগুলিতে এখন পর্যন্ত এ ধরনের অসংখ্য মুসলমান লাখেরাজ রায়তি-স্বত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান।

কিন্তু যারা আমাদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে চাই, এই অসংখ্য রায়তি-স্বত্বের সবই (এগুলির প্রকৃতির দ্বারাই যা কেবলমাত্র মুসলমানদের অধিকারভুক্ত বুঝায়) কি এদেশে অসংখ্য উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন নয়, যা তাদের অতীত বংশাবলীর অধিকারভুক্ত ছিলো? আমরা দৃঢ়তার সহিত বলতে পারি যে, কেউ জোর করে আমাদের বিরুদ্ধ মত পোষণ করতে পারেন না। আমরা আরো প্রশ্ন করছি যে ঐ সমস্ত অসংখ্য পরিবারের ক্রম অগ্রসরমান গতিপথ কি লুপ্ত হয়ে গেছে? এবং যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তাঁদের বংশধরগণ বাংলা দেশে না থেকে কোথায় আছে? আর তাঁরা যদি এ দেশের মুসলমানদের বংশধর না হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁরা কে? আমাদের আশঙ্কা হয় যে, ওপরের প্রশ্নাবলীর জন্যে প্রদত্ত যে কোনো স্পষ্ট জবাবই তাঁদের প্রচারিত মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, যাঁরা আমাদের মতের বিরোধিতা করে থাকেন

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐ সমস্ত লাখেরাজ ও আয়মা রায়তিস্বত্ব ছিলো মুসলমানদের নিজস্ব। বর্তমানে সেই রায়তি-স্বত্বের সবগুলি তাদের অধিকারে নেই। প্রকৃত ঘটনা হলো এই যে, একদিকে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলি ধ্বংসের কবলে পতিত হওয়ায় এবং অপরদিকে সরকারের নিলামনীতি সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করায় সরকার কর্তৃক প্রকাশ্য নিলামের ফলে কিংবা স্বত্বাধি-কারীদের নিজেদের কর্তৃক বেসরকারীভাবে বিক্রয়ের ফলে এই রায়তিস্বত্বগুলি পূর্ব স্বত্বাধিকারীদের হস্তচ্যুত হয়ে গেছে; ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী লোকেরা মুসলমানদের ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করেছে।

একই ধরনের আরেকটি প্রমাণ হলো এই যে, এ দেশের অধিকাংশ পরগণা, গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীর মুসলমানী নামকরণ হয়েছে ; এভাবে একথা স্পষ্টরূপে নির্দেশ করে যে সেগুলির জোতদার এবং মালিকগণ কোনো এক কালে মুসলমান ছিলো। আগের দিনে ভূসম্পত্তি ও 'ইলাকা'গুলি তাদের মালিকদের নামে অভিহিত হওয়ার রীতি প্রচলিত ছিলো এবং সরকারী রেজিস্ট্রি বহিতেও গ্রামগুলি এ নামেই তালিকাভুক্ত হতো। উদাহরণস্বরূপ পরগণা-ই-বারবকাবাদ, পরগণা-ই-জাফরজাল, পরগণা-ই-জওয়ান ইব্রাহিম, পরগণা-ই-বারবক, পরগণা-ই-সোলেমান শাহী, হাবেলি শেরপুর, আযমত শাহী পরগণা, হোসেন উজল্ এবং এ ধরনের আরো অসংখ্য নাম এ দেশের পরগণা ও গ্রামগুলি বহন করছে। এ ধরনের নামগুলি যথেষ্ট প্রমাণ করে যে এ সমস্ত সম্পত্তি প্রথমতঃ মুসলমানদের অধিকারে ছিলো এবং খিলজি ও ঘোরি বংশের আমিরদের নামের সংগে এই নামগুলির খুব বেশী সাদৃশ্য রয়েছে বলে এ ধারণা প্রবল যে এ সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিকগণ সে সময়ের আমির ও অভিজাত মুসলমান ছিলেন। এসমস্ত ভূস্বামী ও এলাকাদার তাঁদের সম্পত্তির ওপরই বসবাস করেছেন বলে স্পষ্টতঃই পল্লী এলাকায় উচ্চ মুসলমান পরিবারদের বসতি প্রাধান্য লাভ করেছে। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করাকেই অধিক পছন্দ করতেন, কেননা গ্রামবাসীরা শহরবাসীদের চাইতে কম বিপজ্জনক ও কম অমংগলজনক ছিলো, যে শহরবাসীরা প্রচণ্ড আন্দোলন ও সরকার পরিবর্তনের প্রতি গ্রামবাসীদের চাইতে অধিক মনোযোগী ছিলো।[১] এ সমস্ত সম্মিলিত কারণের

১ বাংলায় আফগানদের সরকার রাজতন্ত্র জাতীয় ছিলো একথা বলা যায় না, বরং বলা চলে যে ইউরোপে গথ ও ভ্যানডালদের প্রবর্তিত

ফলেই উচ্চ ও নিম্ন বংশজাত মুসলমানগণ বর্তমানে এদেশের পল্লী অঞ্চলের লোকসংখ্যার এতো বড় একটা অংশ গঠন করেছে।

সামন্ত প্রথার সংগে এর অনেকটা সাদৃশ্য ছিলো। বখতিয়ার খিলজি ও পরবর্তী বিজেতাগণ একটি নির্দিষ্ট এলাকে তাঁদের নিজেদের ভূসম্পত্তি হিসেবে পছন্দ করতেন; অন্যান্য জেলা অধস্তন সর্দারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো; সর্দারগণ আবার তাঁদের ক্ষুদ্র সেনানায়কদের মধ্যে এই ভূসম্পত্তিগুলি পুনর্বিভাগ করে দিতেন। এই সেনানায়কদের প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য ভরণপোষণ করতেন যে সেনাদল প্রধানতঃ তাঁদের আত্মীয় ও আশ্রিত লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হতো। যাহোক, এই লোকগুলি নিজেরা ভূমি চাষ করতেন না, কিন্তু প্রতিটি কর্মচারী একটি ক্ষুদ্র ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিলেন এবং তাঁর অধীনে ছিলো একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক হিন্দু রায়ত; নিজের স্বার্থেই যাদের সংগে তিনি ন্যায়পরায়ণতা ও সংযমের সহিত আচরণ করতেন। যদি ঘন ঘন প্রভুর পরিবর্তন না ঘটতো এবং অনবরত বিদ্রোহ ও আক্রমণের দৃশ্য দেখা না যেতো, তাহলে ভূমির কৃষকগণ অপেক্ষাকৃত সুখী অবস্থায় কালাতিপাত করতে পারতো; কিন্তু উক্ত বিশৃঙ্খল অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতি খুব কমই মনোযোগ দেয়া সম্ভব হতো; এবং ভারতের অন্য অংশে সেখানকার দেশীয় লোকদের অর্থাৎ রোহিলাদের নিজস্ব সরকারাধীনে পরবর্তীকালে চাষের যেরূপ উন্নতি হয়েছিলো বাংলার কৃষিরও তদ্রূপ উন্নতি হতো।

সন্দেহ নেই যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো; কিন্তু ইহাও সম্ভাব্য মত যে ব্যবসায়ের প্রতি পরাঙ্মুখ হয়ে কিংবা গৃহ ত্যাগ করে দলপতির সংগে যোগদানের জন্যে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রিত হয়ে আফগান কর্মচারীদের অনেকেই ধনী হিন্দুদের নিকট তাঁদের ভূসম্পত্তি ইজারা দিতেন, যাদেরকে শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধাদি লাভের অনুমতি দেয়া হতো।

বৃত্তি হিসাবে প্রদত্ত হাজার বিঘা লাখেরাজ ভূমিসহ সমাধি-স্তম্ভ, গোরস্তান, ফকির-দরবেশের আস্তানা, পবিত্র স্থান ও মসজিদের চিহ্ন এখন পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি গ্রাম বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে দৃষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে সামান্য অংশমাত্র এর যথার্থ উত্তরাধিকারিদের প্রমাণের উদ্দেশ্যে আজও টিকে আছে এবং যেখানে এগুলি টিকে আছে সেখানে যে সুদূর অতীতে বিখ্যাত ও দরবেশতুল্য মুসলমানদের অস্তিত্ব ছিলো ওপরের কথাটি তারই নির্দেশ দেয়।

টীকা *

মুসলমান শাসকদের আমলে বাংলার ভূমি দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো : তাদের একটা ছিলো 'সরকারী ভূমি', যার রাজস্ব সরকারী বিধি ব্যবস্থায় আদায় করা হতো এবং যা 'খলসা ভূমি' নামে অভিহিত হতো। আরেক ধরনের জমির মালিক ছিলেন আমির ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, যা ছিলো তাঁদের জায়গিরের অন্তর্ভুক্ত। সম্রাট আকবরের সময়ে 'খলসা ভূমি' থেকে উৎপন্ন আয়ের পরিমাণ ছিলো ৬৩০৩৭৫২৲ টাকা এবং 'জায়গির' থেকে উৎপন্ন আয়ের পরিমাণ ছিলো ৪৩ লক্ষ টাকা (দ্রষ্টব্য : Parliamentary V. Report)।

খলসা ভূমি—এই ভূমির রাজস্বের বিধিব্যবস্থার জন্যে সরকার 'আওয়ামিল' নিযুক্ত করতেন এবং তাঁদের অধীনে যে সমস্ত লোক রাজস্ব আদায় ও সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হতেন তাঁদেরকে বলা হতো জমিদার। এই পরবর্তী কর্মচারিগণ রায়তদের নিকট থেকে

* দ্রষ্টব্য : আইন-ই-আকবরি।

রাজস্ব আদায় করে তা পরে রাজ-কোষাগারে প্রেরণ করতেন ; এ কাজের জন্যে তাঁদেরকে একটা নির্দিষ্ট হারে কমিশন দেয়া হতো। বাংলা দেশে এই জমিদারদের অনেকেই ছিলেন কায়স্থ গোত্রের হিন্দু। প্রকৃতপক্ষে ভূমির ওপর জমিদারদের কোনো অধিকার ছিলো না ; পক্ষান্তরে তাঁরা ছিলেন অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর মতোই। কিন্তু তখনকার অধিকাংশ সরকারী পদই বংশগত ছিলো বলে এ পদে পিতার পর পুত্রের নিয়োগ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হতো। কিন্তু বস্তুতঃ জমিদারদের বরখাস্ত ও নিয়োগ ছিলো সম্পূর্ণভাবে তখনকার সার্বভৌম শাসকের ক্ষমতাধীন। কোনো জমিদার কোনো ত্রুটি বা অপরাধের জন্যে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের নিয়োগ বাতিল করা এবং তা পূর্ণ করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো সরকারের মর্জির ওপর। সে সময়ে রাজস্ব আদায়, আদায়কৃত রাজস্ব সরকারী তহবিলে প্রেরণ, তার যথাযথ হিসাব দাখিল এবং এ ধরনের কাজের মতো গুরুদায়িত্ব জমিদারের ওপর ন্যস্ত হতো। রাজস্ব আদায় ও তা সরকারী তহবিলে প্রেরণের কাজে কোনো দোষত্রুটি ধরা পড়লে জমিদারকে কঠোর শাস্তি পেতে হতো এবং সে কারণে তাঁদেরকে নানা ধরনের কষ্ট ভোগ করতে হতো। তাছাড়া এ ধরনের অপরাধীদের জন্যে অন্যান্য শাস্তির মধ্যে কারাদণ্ড, এমন কি শারীরিক নির্যাতনেরও বিধান ছিলো অধিকন্তু জমিদারকে তাঁদের কর্তৃত্বাধীন এলাকার মধ্যে অনুষ্ঠিত চুরি, ডাকাতি, খুন এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধের জন্যে জবাবদিহি করতে হতো।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কায়স্থ গোত্রের লোকদেরকে জমিদার হিসেবে নিয়োগ করার একটি কারণ এই যে, কৃষি ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণা অন্যান্য লোকের চাইতে অধিক ছিলো।

আরেকটি কারণ এই যে, তখন জমিদারের পদ গ্রহণের সময় যে সমস্ত কঠোরতা সরকারের দাবীর সংগে থাকতো এবং জমিদারদের স্কন্ধে তখন যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হতো সেগুলি ঐ পদগ্রহণকারী কায়স্থের চাইতে উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের জন্যে ছিলো বিঘ্নস্বরূপ, যাঁরা সেই পদের সংগে সংস্পৃষ্ট সমস্ত দায়িত্ব থেকে তাঁদের নিজেদেরকে যতদূর সম্ভব মুক্ত রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে, এ পেশার সংগে এতো বেশী সন্ত্রাস জড়িয়ে থাকতো যে বৃটিশ সরকারের শাসনামলের প্রারম্ভে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েম হওয়ার পরেও সাবধানী লোকেরা প্রথম প্রথম জমিদারি গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করতেন। যদি তাঁরা লাভের খাতিরে জমিদারি গ্রহণের জন্যে প্রলুব্ধ হতেন, তাহলে তাঁরা তা ছদ্মনামে গ্রহণ করতেন। এমতাবস্থায় এদেশে জমিদারি পেশা মুসলমান শাসকদের আমলে প্রায় কায়স্থ গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং উল্লিখিত রীতি সমগ্র মুসলিম যুগব্যাপী কমবেশী প্রচলিত ছিলো।

যখন বৃটিশ শাসন শুরু হয়, তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের স্থায়ী বংশগত অধিকার কায়েম করে। তখন থেকে জমিদারগণ ভূমিতে তাঁদের মালিকানাস্বত্ব লাভ করতে থাকেন। বৃটিশ সরকারের অধীনে ভূমি থেকে প্রাপ্ত আয়ের হার দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় তার ফলস্বরূপ জমিদারদের অবস্থাও অধিকতর উন্নত ও সমৃদ্ধ হতে লাগলো।

অপরশ্রেণীর ভূমি বা জায়গির ভূমি—এই শিরোনামায় আমি মসনবি ও অ-মসনবি জায়গির, আয়মা, মদদি-ম'আশ এবং অন্যান্য ধরনের সমস্ত নিষ্কর ভূমি সম্পর্কে আলোচনা করবো। এসমস্ত

ভূমি দেশের অভিজাত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিলো। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, মনসবদারগণ, প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান কিংবা সম্ভ্রান্ত বংশজাত লোক এবং আধ্যাত্মিক নেতৃবৃন্দ জায়গির, আয়মা ও মদদি-ম'-আশের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হিসেবে সম্মানিত হতেন। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত খরচ এবং তাঁদের চাকরির জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের খরচাদি তাঁদের নিজ নিজ ভূসম্পত্তির রাজস্ব থেকে নির্বাহ করা হতো। তাঁদের নিকট দাবী করা হলে তাঁরা তাঁদের রাজা ও দেশের জন্যে কাজ করতেন। প্রতিটি মনসবদার তাঁর জায়গিরের সম্পদের অনুপাতে একটি মিলিশিয়া বাহিনীর ভরণ-পোষণ করতেন এবং এই বাহিনী নিয়ে যুদ্ধের সময় তিনি সরকারকে সাহায্য করতেন। তাঁরা তাঁদের নিজেদের সুবিধার জন্যে নিজ নিজ ভূসম্পত্তি শাসন করতেন ; কিন্তু তাঁরাও তাদের অধিকারভুক্ত সম্পত্তির রাজস্ব সংগ্রহের কাজের দায়িত্ব কায়স্থ গোত্রের লোকদের ওপর অর্পণ করতেন, যাঁরা এই অর্থেও জমিদার খেতাবে অভিহিত হতেন। তাহলে জমিদার শব্দটি এমন একজন লোককে বুঝাতো, যিনি কমিশন লাভের বিনিময়ে ভূস্বামীর পক্ষ হয়ে ভূমির রাজস্ব আদায় করতেন এবং ঐ রাজস্ব তাঁর নিকট জমা দিতেন।

পদমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোকদের অধিকৃত জায়গির দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলো : এদের একটি ছিলো বংশগত ও স্থায়ী এবং অপরটি বংশগত ও স্থায়ী ছিলো না, তা ছিলো অস্থায়ী। প্রথমোক্ত শ্রেণীর জায়গিরের অধিকারী ছিলেন প্রসিদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তিগণ, অর্থাৎ যাঁরা জনসাধারণের ধর্মীয় নেতা ও সদ্বংশজাত লোক হিসেবে সম্মান পেয়ে থাকেন। এসমস্ত জায়গিরদারকে তাঁদের সম্পত্তি থেকে অধিকারচ্যুত করার ক্ষমতা রাজার ছিলো না ;

পক্ষান্তরে রাজা সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁদের অনুসরণ করতেন।

যথার্থভাবে বলতে গেলে যদিও সরকারী কর্মচারী ও মনসবদার-দের জায়গির অস্থায়ীভিত্তিক ছিলো, তথাপি সে সময়ে অধিকাংশ নিয়োগই বংশগত ছিলো বলে এবং তা একই পরিবারে থেকে যেতো বলে স্বাভাবিকভাবেই সে সমস্ত জায়গির কিয়ৎ পরিমাণে বংশগত বলেই বিবেচিত হতো. কোনো পরিবারে এহেন জায়গিরের বংশগত ভোগাধিকারের ধারাবাহিকতা তখনই লোপ পেতো, যখন পদাধিকারী ব্যক্তি তাঁর অফিস কর্তৃক সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতেন। এধরনের ব্যাপার ঘটলে এভাবে পুনরুদ্ধারকৃত জায়গির একই নিয়মে তাঁকেই দেয়া হতো, যিনি এ শূন্যপদে নিযুক্ত হতেন। বাংলা দেশ দীর্ঘকাল যাবৎ স্বাধীন শাসনকর্তাদের দ্বারা শাসিত হয়েছে বলে জায়গির থেকে এ ধরনের উচ্ছেদ এবং এর বিলি-ব্যবস্থা খুব কমই সংঘটিত হতো। কেবলমাত্র শাসন-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে এবং এক রাজবংশ থেকে অপর রাজবংশে শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত হলে এর ব্যতিক্রম দেখা দিতো। কিন্তু যখন এদেশ কোনো বিদেশী শক্তির পদানত হতো, তখন অবশ্য আগের শাসন-ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হতো। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বাংলা দেশ যখন তার আযাদি হারালো এবং মোগল সম্রাটদের শাসনাধীনে এলো, তখন এদেশের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলির অধিকার থেকে মসনবি জায়গির চলে গেলো এবং বিদেশী মোগল আমিরদের অধিকারে এলো। কিন্তু তথাপি তখন উচ্চ-বংশজাত লোক ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সংযত ও কোমলতা প্রদর্শিত হয়েছিলো ; কেননা তাঁদের জায়গিরের কিয়দংশ তাঁদের অধিকারে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো, কিংবা সম্পূর্ণ

জায়গির সরকার অধিকার করে তার বদলে তাঁদেরকে নতুন দান বরাদ্দ করেছিলেন। অধিকন্তু মোগল সম্রাটগণ সম্ভ্রান্ত ও ধার্মিক লোকদেরকে অসংখ্য মদদ-ই-ম'আশ (এক প্রকার নিষ্কর সম্পত্তির রায়তিস্বত্ব) দান করেছেন ; কিন্তু মোগলদের শাসনামলে জায়গিরের পুনরুদ্ধার ও দান এবং বৃদ্ধি ও অদল-বদল সর্বদাই চলতো।

পরবর্তীকালে এদেশ যখন বৃটিশ শাসনের অধীনে এলো, তখন পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত কর্মচারী ও মনসবদার তাঁদের চাকরি হারালেন এবং তৎকালীন শাসন কর্তৃপক্ষ সমস্ত মসনবি ও অ-মসনবি জায়গির পুনরুদ্ধার করে নিলেন ; কিছু কিছু অধিকারচ্যুত জায়গিরের পরিবর্তে বৃত্তি দেয়া হলো ; পদচ্যুত কর্মচারী ও মনসবদারদের পরিবর্তে নগদ টাকায় পরিশোধ্য বেতনে ইউরোপীয় কর্মচারীদেরকে নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু সে সময়েও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সম্ভ্রান্ত ও ধর্মীয় লোকদের জায়গির যেমন ছিলো তেমনি থাকার অনুমতি দান করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে আইন ও নিয়মকানুন প্রণয়ন করেন। তা সত্ত্বেও আইনের কঠোরতার জন্যে এবং অন্যান্য কারণে পরিশেষে অসংখ্য লাখেরাজ জমির রায়তি-স্বত্ব এবং ভূসম্পত্তি সরকার পুনরুদ্ধার করেন।

যে সমস্ত মসনবি ও অন্যান্য ধরনের জায়গির সময় সময় সরকার পুনরুদ্ধার করতেন, খালসা ভূমির মতো একই নিয়মে রাজস্বের বিনিময়ে জমিদারদের সংগে সেগুলির বন্দোবস্ত হতো। পরিণামে ভূমির আসল মালিকগণ, যাঁরা বিনা করে ভূমির অধিকার ভোগ করতেন এবং যাঁরা ছিলেন দেশের সেরা ব্যক্তি, এখন সম্পূর্ণ-রূপে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাঁদের পরিবর্তে সরকারী রাজস্ব এজেন্ট কিংবা জমিদারগণ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র বদৌলতে জমির স্বত্বাধিকার লাভ করেন। এ আমূল পরিবর্তন বৃটিশ শাসনের

প্রারম্ভেই সাধিত হয় এবং প্রকৃতপক্ষে বৃটিশ সরকারই জমিদারগণকে ভূস্বামীতে পরিবর্তিত করেন; কেননা এখন তাঁরা যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, আগে তাঁদের তেমন মর্যাদা ছিলো না। তখন মনসবদার ও অন্যান্য জায়গিরদারই ছিলেন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি।

মিঃ জন গ্র্যান্ট লিখেছেন যে বাংলার দুই-পঞ্চমাংশ ভূমির অধিকারী ছিলেন আমির ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং অবশিষ্ট তিন-পঞ্চমাংশের মালিক ছিলেন শাসনরত রাজা। এর থেকেই একথা ধারণা করা যায় যে, কত বিপুল সংখ্যক মর্যাদাসম্পন্ন লোক, জায়গিরদার ও মনসবদার এদেশে বাস করতেন। যদিও এই জায়গিরদারগণ অদৃশ্য হয়েছেন, তাঁদের পদ লোপ পেয়েছে এবং তাঁদের জায়গির সরকারের হাতে চলে গেছে, তথাপি তাঁদের পদচিহ্নের অস্তিত্ব অদ্যাবধি রয়ে গেছে এবং তাঁদের বংশধরগণ এখনো এদেশে আমাদের মধ্যেই বাস করছেন।

আমাদের মনে হয়, আমরা যদি মনসবের প্রকৃতির সংগে সম্পর্কযুক্ত কোনো কিছু এবং এ ধরনের পদাধিকারীদের কথা এখানে উল্লেখ করি, যার থেকে বোঝা যাবে যে এ রাজ্যে কত সংখ্যক অভিজাত মুসলমান ছিলেন এবং এই উচ্চপদস্থ অভিজাত ব্যক্তিগণ কি ধরনের ছিলেন তাহলে তা আমাদের পাঠকবর্গের নিকট অহিতকর হবে না। আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্যে আমরা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে 'আইন-ই-আকবরি'র বিধি এবং এতৎসঙ্গে তার ওপরে প্রদত্ত ডঃ ব্রকম্যানের মূল্যবান টীকার উল্লেখ করছি।

অধ্যাপক ব্রকম্যানকৃত আকবরের রাজত্বের 'সদর' সম্পর্কে টীকা :

এই 'আইন'-এ—যা সমগ্র কর্মের মধ্যে একটি অত্যন্ত কৌতূহলজনক ব্যাপার—চাঘ্‌তাই শব্দ 'সুয়ুরগাল'-এর অনুবাদ

আরবীতে করা হয়েছে 'মদদ-উল-ম'আশ', ফার্সীতে করা হয়েছে 'মদদ-ই-ম'আশ', যার জন্যে আমরা পাণ্ডুলিপিতে প্রায়ই 'মদদ-ও-ম'আশ দেখতে পাই। শেষোক্ত পদটির অর্থ বোঝায় 'জীবিকা-নির্বাহের সাহায্য' এবং এর সমতুল্য (মিল্ক) কিংবা সম্পত্তি, ইহা আবুল ফযল বর্ণিত হিতকর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভূমিকে নির্দেশ করে। এ ধরনের ভূমি ছিলো বংশগত এবং এ কারণেই ইহা জায়গির কিংবা 'তুযুল' থেকে আলাদা, যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মনসবদারগণকে বেতনের পরিবর্তে দান করা হতো।

এ আইন প্রমাণ করে যে আকবর স্বেচ্ছাচারিতার সহিত খুব বেশী করে সুয়ুরগাল্ ভূমির বিরোধিতা করেছেন। যে ভূমি তাঁর পছন্দ হয়েছে তাই তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন এবং বহু মুসলমান (আফগান) পরিবার ধ্বংস করে তাঁর রাজ্য কিংবা খলসা ভূমির পরিধি বৃদ্ধি করেছেন। তিনি সদরের ক্ষমতাও সম্পূর্ণরূপে খর্ব করে দেন, যাঁর সম্মান বিশেষকরে মোগল রাজবংশের ক্ষমতা-লাভের পূর্বে অত্যধিক ছিলো। এই সদরের কিংবা সাধারণভাবে অভিহিত সদর-ই-জাহানের নির্দেশেই জুলুস অথবা কোনো নতুন রাজার সিংহাসনারোহণকে অনুমোদন করতো। আকবরের রাজত্ব-কালেও তিনি পদমর্যাদার দিক থেকে সাম্রাজ্যের মধ্যে চতুর্থ স্থানের অধিকারী ছিলেন দ্রষ্টব্য : ৩০ নং আইনের শেষাংশ)। এই সদরের ক্ষমতাও ছিলো প্রচুর। তাঁরা ছিলেন সর্বোচ্চ আইন-কর্মচারী এবং তাঁদের ক্ষমতা ছিলো আমাদের মধ্যে প্রধান-প্রশাসকদের সমতুল্য। ধর্ম ও পরোপকারের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত জমি উৎসর্গ করা হতো, তাঁরা সেগুলির তত্ত্বাবধান করতেন এবং রাজার এ ধরনের ভূমি স্বাধীনভাবে দান করার মতো অপরিমিত ক্ষমতার অধিকারীও তাঁরা ছিলেন। তাছাড়া তাঁরা ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ আইন-

কর্মচারী এবং ধর্মসংক্রান্ত বিচারালয়ের উচ্চ বিচারকের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন। এই ক্ষমতার বলে আবদুল নবি, সদরের পদে বহাল থাকাকালে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচরণের অপরাধে দু'জন লোকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য : পৃঃ ১৭৭)।

মোগলদের আগের যুগে 'ইদ্‌রারাত', 'বযায়েফ', 'মিল্ক', 'ইনাম-ই-দেহা', 'ইনাম-ই মমিনহা' ইত্যাদি কথাগুলি 'সুয়ুরগাল' (কিংবা কোনো কোনো অভিধানের বানান অনুযায়ী 'সেয়ুরগাল' বা 'সুঘারগাল') শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে দেখা যেতো।

আগের রাজাদের মধ্যে আলাউদ্দীন খিলজি কুখ্যাত ছিলেন এজন্যে যে তিনি অবজ্ঞাভরে পূর্ববর্তী শাসকদের দান বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি 'মদদ-ই-ম'আশ' রায়তিস্বত্বের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করে সেগুলিকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করেন তিনি এই উচ্চপদে তাঁর চাবি বহনকারীদেরকে নিযুক্ত করে সদরের মর্যাদাও ক্ষুন্ন করেছিলেন (তারিখ-ই-ফিরিশতাহ্, পৃঃ ৩৫১)। যাহোক, কুতুবউদ্দীন মুবারক শাহ্ তাঁর বারো বছর চার মাস কালের শাসনামলে আলাউদ্দীন কর্তৃক পদচ্যুত কর্মচারীদের অনেককে তাঁদের পূর্বপদে পুনরায় বহাল করেছিলেন (তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃঃ ৩৫৮)।

শেরশাহ্ ভূমিদান করে যে উদারতা দেখিয়েছেন তজ্জন্য তিনি মোগল ঐতিহাসিকদের হাতে প্রায়ই অভিযুক্ত হয়েছেন, একথা ওপরে (অর্থাৎ তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ২৫৬-এর টীকায়) উল্লিখিত হয়েছে। সম্রাট আকবর কেন যে তাঁর সময়কার দান-ভোগকারীদের প্রতি এ ধরনের অপ্রত্যাশিত নির্মমতা দেখিয়েছেন, এটাও তার একটা কারণ হতে পারে।

প্রতিটি 'কুলাহ্'-তে একজন সদর-ই-জায কিংবা প্রাদেশিক সদর ছিলেন, যাঁরা প্রধান সদরের (সদর-ই-জাহান বা সদর-ই-কুল বা সদর-ই-স্বদূর) আদেশাধীনে কাজ করতেন

অন্যান্য দপ্তরের মতো 'সদর'দের দপ্তরেও ব্যাপকভাবে ঘুষ গ্রহণ করার প্রথা প্রচলিত ছিলো। একজন স্বত্বাধিকারীর ফরমানে যে পরিমাণ ভূমির উল্লেখ থাকতো তার সংগে উক্ত স্বত্বাধিকারীর অধিকৃত প্রকৃত ভূমির পরিমাণের পার্থক্য ছিলো বিস্তর। অথবা ফরমানের ভাষা এমন দ্ব্যর্থকভাবে লেখা হতো যে স্বত্বাধিকারী ইচ্ছা করলে আরো বেশী ভূমির অধিকার ভোগ করতে পারতেন এবং তিনি যতদিন পর্যন্ত কাযি এবং প্রাদেশিক সদরকে ঘুষ দিতেন ততদিন পর্যন্ত সেই অতিরিক্ত ভূমি তাঁর অধিকারে রাখতে পারতেন। এ কারণেই পুনঃ পুনঃ তদন্তের পর সম্রাট আকবর যে পূর্ববর্তী শাসকদের প্রদত্ত দানগুলি বাতিল করেছেন তা ছিলো যুক্তিসংগত। সম্রাটের ধর্মীয় মতবাদ (দ্রষ্টব্য : তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃঃ ১৬৭) এবং উলেমাদের প্রতি তাঁর পোষিত ঘৃণা থেকেই, যাদের অনেকেই নিকর ভূমির অধিকারী ছিলেন, তিনি তাঁদের দান হিসেবে ভোগকৃত ভূমিগুলি পুনরুদ্ধার করার পক্ষে ব্যক্তিগত এবং সে কারণে অধিকতর জোরালো যুক্তি পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়। তিনি তাঁদেরকে ভূমিহীন করে সিন্ধুর ভক্করে কিংবা বাংলা দেশে তাড়িয়ে দেন, যে দেশের জলবায়ু সে সময়ে পরবর্তী-কালের মতোই খারাপ ছিলো। যে লোককে আকবর স্বহস্তে তাঁর চটিজুতো সুবিন্যস্ত করে দিয়ে সম্মান দেখাতেন, সেই আবদুল নবির পতনের পর সুলতান খাজা নামক একজন খোদাভক্ত ধার্মিক প্রবরকে (দ্রষ্টব্য : তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃঃ ১৬৭) সদর হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ; এবং তাঁর পরে সদরগণের স্বাধীনভাবে সম্রাট

আকবরের ভূমি দান করার ক্ষমতা এতো বেশী সীমিত করা হয় এবং তাঁদের লক্ষ্য রাখার মতো দানের পরিমাণ এতো কমে যায় যে, তা বদায়ুনিকে ব্যংগাত্মক মন্তব্য করতে প্রবৃত্ত করে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আকবরের সদর ছিলেন—

১। শেখ গদাই—একজন শিয়া, বৈরামখানের সুপারিশে নিযুক্ত, ৯৬৮ হিজরি পর্যন্ত।

২। খাজা মুহম্মদ কলিশ—৯৭১ হিজরি পর্যন্ত।

৩। শেখ আবদুল নবি—৯৮৬ হিজরি পর্যন্ত।

৪। সুলতান খাজা—৯৯৩ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।

৫। শিরাজের আমির ফতেহ্ আল্লাহ্—৯৯৭ হিজরি পর্যন্ত।

৬। সদর জাহান—যাঁর নাম তাঁর পদের অনুরূপ ছিলো।

আবুল ফযল মৌলানা আবদুল বাকি নামে একজন সদরেরও উল্লেখ করেছেন; কিন্তু আমি জানি না তিনি কখন এই পদে বহাল ছিলেন।

আমি বদায়ুনি থেকে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করছি—

পৃষ্ঠা ২৯। শেখ গদাই মদদ-ই-ম'আশ ভূমি বাতিল করে দেন এবং খান যাদাদের (আফগানদের) উইল-করা সম্পত্তি কেড়ে নেন। যে ব্যক্তি অবমাননাকর আচরণ সহ্য করতে পারতো কেবল তাকেই 'সুয়ুরগাল' দান করা হতো, অন্যকে নয়। তা সত্ত্বেও বর্তমান কালের সংগে তুলনা করলে যখন মাটির প্রতিটি জরিবের, কেবল জরিবই নয়, তার চাইতেও ন্যূন অংশের অধিকারে বাধা উত্থাপিত হয়, তখন আপনি শেখকে আ'লম বক্স (যিনি একটি পৃথিবী বিতরণ করেন) বলতে পারেন।

পৃষ্ঠা ৫২। শেখ গদাইয়ের পর খাজা মুহম্মদ কলিশ ৯৬৮ হিজরিতে সদর নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনি এমন ব্যাপক ক্ষমতার

অধিকারী ছিলেন না যাতে তিনি মদদ-ই-ম'আশ হিসেবে জমি দান করতে পারেন ; কারণ তিনি ছিলেন দেওয়ানদের অধীনস্থ ব্যক্তি।

পৃষ্ঠা ৭১। ৯৭২ হিজরিতে কিংবা হয়তো আরো সঠিকভাবে বলা চলে যে ৯৭১ হিজরিতে শেখ আবদুল নবি সদর নিযুক্ত হন। জমি বিতরণের ব্যাপারে তাঁকে তখনকার উযির ও উকিল মুযাফ্ফর খানের সংগে পরামর্শ করতে হতো। কিন্তু শীঘ্রই তিনি যোগ্য লোকদেরকে জীবিকা-ভাতা, ভূমি এবং পেন্সনের সবটাই দান করার মতো চূড়ান্ত ক্ষমতা এতো বেশী পরিমাণে লাভ করলেন যে, যদি আপনি হিন্দুস্তানের পূর্ববর্তী সমস্ত রাজার দান দাঁড়ি-পাল্লার এক দিকে এবং শেখের দানগুলি অপর দিকে রাখেন তাহলে শেখের পাল্লার ওজনই বেশী হবে। কিন্তু কয়েক বছর পরেই পূর্ববর্তী রাজাদের যেরূপ ছিলো, শেখের পাল্লাও তদ্রূপ ওপরে উঠে গেলো এবং ব্যাপার উল্টো দিকে মোড় নিলো।

পৃষ্ঠা ২০৪। ৯৮৩ হিজরিতে মহামান্য সম্রাট এই মর্মে আদেশ দেন যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের আয়মা সম্পত্তিগুলি প্রতিটি পরগণাস্থ ক্রোড়িদের দ্বারা ইজারা দেয়া হবে না, যে পর্যন্ত না তাঁরা পরীক্ষা ও সত্য প্রতিপাদনের জন্যে সদরের নিকট তাঁদের ফরমান উপস্থাপিত করে, যাতে তাঁদের দান, জীবিকা-ভাতা ও পেন্সনের কথা বর্ণিত আছে। একারণে পূর্ব দেশীয় জেলাগুলি থেকে সিন্ধুস্থ ভক্কর পর্যন্ত এলাকার বিপুল সংখ্যক যোগ্য লোক দরবারে আগমন করেন। যদি তাঁদের কেউ কোনো আমিরকে কিংবা সম্রাটের কোনো নিকট বন্ধুকে তাঁর শক্তিশালী রক্ষক হিসেবে পেতেন, তাহলে তিনি তাঁর ব্যাপারের ফয়সালা করার ব্যবস্থা করতে পারতেন ; কিন্তু যাঁরা এ-ধরনের সুপারিশ লাভে বঞ্চিত হতেন তাঁরা শেখের প্রধান কর্মচারী সৈয়দ আবদুর রসুলকে ঘুষ

দিতে বাধ্য হতেন কিংবা তাঁর ফরাস, দ্বারোয়ান, সহিস এবং মেথরদের মাধ্যমে তাঁর করুণা লাভের জন্যে তাদেরকে উপহার দিতেন। যাহোক, তাঁরা জোরালো সুপারিশ লাভে বঞ্চিত হলে কিংবা ঘুষের আশ্রয় নিতে না পারলে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যেতেন। অনেক আয়মাদার তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়ে আবেদনকারীদের ভিড়ের চাপে মৃত্যুবরণ করেছেন। যদিও এই ঘটনার একটি রিপোর্ট সম্রাটের কর্ণগোচর হয়েছিলো, তথাপি এই ভাগ্যহত লোকদেরকে সম্রাটের সম্মুখে নিয়ে যেতে কেউ সাহস করেনি। শেখ যখন তাঁর সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের সংগে তার মসনদে (গদিতে) বসেন এবং প্রতি-পত্তিশালী আমিরগণ বৈজ্ঞানিক অথবা ধার্মিক লোকদেরকে তাঁর দপ্তরে এনে তাঁর নিকট উপস্থাপিত করেন, তখন শেখ তাঁদেরকে অবজ্ঞার-জনকভাবে গ্রহণ করেন, তিনি তাঁদেরকে কোনো সম্মান দেখাননি। বহু জিজ্ঞাসাবাদ, অনুনয়বিনয় ও অতিশয়োক্তির পর তিনি উদাহরণ স্বরূপ 'হিদায়াহ' (আইন সম্পর্কিত একটি পুস্তক) ও অন্য ন্য কলেজ পুস্তকের একজন শিক্ষককে প্রায় এক শ' বিঘা জমি দান করেন; এবং এ ধরনের লোক বহুদিন ধরে এর চাইতে অধিক জমির অধিকারী হলেও শেখ সে জমি কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি খ্যাতিহীন কিংবা নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে এমনকি হিন্দুদেরকেও ব্যক্তিগত অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ নিষ্কর ভূমি দান করেছিলেন। তখন থেকেই বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদেরকে গণনার আওতায় আনা হয়েছিলো।

... .

আবদুল নবির পরিণতি ওপরে বর্ণিত হয়েছে। সম্রাট আকবর মক্কার দরিদ্রদের সাহায্যার্থে তাঁকে অর্থ দিয়ে তথায় হজব্রত সম্পাদনের জন্যে পাঠান। তিনি মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে সেই টাকার হিসাব দেয়ার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়

এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ৯৯২ হিজরিতে তিনি 'কোনো এক পাজি' লোকের হাতে নিহত হন।

পরবর্তী সদর ছিলেন সুলতান খাজাহ্। সুয়ুরগাল সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি তখন ভিন্নপথে মোড় নিলো। সম্রাট আকবর ইসলাম পরিত্যাগ করেছেন এবং মক্কা থেকে সম্ভ আগত নতুন সদর খোদাভক্তদের দলভুক্ত হয়েছেন। শিক্ষিত ও আইনজ্ঞ লোকদের ওপর সুকল্পিত উৎপীড়ন শুরু হয়েছে এবং মহামান্য সম্রাট ব্যক্তিগত-ভাবে সমস্ত দানের তদন্ত করেছেন (দ্রষ্টব্য : তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ১০৯, শেষ স্তবক)। তখন জমিগুলি দৃঢ়তা সহকারে প্রত্যাহার করা হলো এবং বদায়ুনির মতে, যিনি এক হাজার বিঘা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর ভূমিই সর্বপ্রথম বাজেয়াপ্ত হয়েছিলো। আবদুল নবীর প্রবল বিরাগভাজন হয়ে বহু মুসলমান পরিবার নিঃস্ব কিংবা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।

৯৯৩ হিজরিতে শিরাযের ফতেহ্ আল্লাহ্ (দ্রষ্টব্য : তারিখ-ই-ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ৩৮ , সদর নিযুক্ত হন। সুয়ুরগাল-এর কাজকর্ম এবং এতৎসংগে সদরের মর্যাদা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে পেতে শূন্যের কোঠায় পৌঁচেছিলো বলে সদর হলেও ফতেহ্ আল্লাহ্ খানকে দাক্ষিণাত্যের দিকে বিশেষ কাজের জন্যে ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয়েছিলো।—বদায়ুনি, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

তাঁর শিরাযি ভৃত্য কামাল তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে কাজ করেছে এবং ভূমিহীন আয়মাদারদের প্রতি যত্ন নিয়েছে, নানাস্থানে যাদের সামান্য জমি ছিলো ; কেননা সদরের মর্যাদা এর 'কামাল'-এর (পূর্ণতার) নিকটবর্তী হয়েছিলো। মাত্র পাঁচ বিঘা ভূমি দান করার মতো ক্ষমতাও ফতেহ্ আল্লার ছিলো না ; প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন কল্পিত সদর, কেননা সমস্ত ভূমি আগেই

বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই বাজেয়াপ্ত জমি বন্য জীবজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হয়েছিলো এবং এরূপে আয়মাদার কিংবা কৃষক কারুর অধিকারেই সেগুলি ছিলো না। যাহোক, এ সমস্ত উৎপীড়নের মধ্যেও সদরের বইপত্রে একটা রেকর্ড বেঁচেছিলো, যদিও, সেটা সদরের দপ্তরের মধ্যে কেবল তার নাম ছাড়া আর কিছুই নয়।'

(তারিখ-ই ফিরিশতা, পৃষ্ঠা ৩৬৮) ফতেহ্ আল্লাহ্ (সদর নিজে) মহামান্য সম্রাটের সম্মুখে এক হাজার টাকার একটি থলে রাখলেন, যে অর্থ তাঁর সংগ্রহকারী উৎপীড়নের সাহায্যে, অথবা আয়মাদার আর আসবে না কিংবা সে মৃত এই ছলনার আশ্রয়ে বসোয়ার পরগণার (যা ছিলো তার জায়গির) বিধবা ও ভাগ্যহত এতিমদের ওপর বলপ্রয়োগ করে আদায় করেছে; তিনি সেই থলে সম্রাটের সম্মুখে রেখে বললেন 'আমার সংগ্রহকারিগণ আয়মাদারদের নিকট থেকে কিফায়াত (অর্থাৎ, সংগ্রহকারিগণ মনে করেছে যে সুয়ুরগাল স্বত্বাধিকারীদের জীবনধারণের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণের চাইতে বেশী আছে) হিসেবে এই টাকা সংগ্রহ করেছে।' কিন্তু সম্রাট এই টাকা তাঁকে তাঁর নিজের জন্যে রেখে দিতে অনুমতি দিলেন।

পরবর্তী সদর, সদর জাহান খোদাভক্ত ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন ফতেহ্ আল্লাহ্ খানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি সদর হিসেবে নিযুক্ত হলেও বদায়ুনি তাঁকে মুফ্তি-ই-মমলিক-ই-মাহ্রুশ, সাম্রাজ্যের মুফ্তি এ নামেই অভিহিত করতে থাকেন, যা তাঁর আগেকার খেতাব ছিলো। হয়তো সদরের পদের জন্যে পৃথক কর্মচারী রাখার আর প্রয়োজন ছিলো না। সদর জাহান সম্রাট জাহাংগীরের অধীনেও তাঁর চাকরি বজায় রেখেছিলেন।

সুয়ুরগাল ভূমির একটা বিরাট অংশ আবুল ফজল কৃত তৃতীয় গ্রন্থের ভৌগোলিক পীঠিকায় পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংগালী মুসলমানদের দৈহিক গঠন, মুখাবয়ব এবং বিশিষ্ট লক্ষণ সমূহ

বাংলার আদি মুসলমান বসতি স্থাপনকারীদের মুখের ও অন্যান্য অংশের বৈশিষ্ট্য যা-ই থাকুক না কেন, তাদের মুখাবয়ব ও এর বিশিষ্ট লক্ষণগুলি এ দেশের জলবায়ু ও মাটির প্রভাবে সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাদের বংশধরদের চেহারা থেকে মুছে গেছে এবং লোপ পেয়েছে। কাজেই এদেশে তাদের বংশধরদের মধ্যে মোগল ও পাঠানদের দেহের উজ্জ্বল ও গোলাপী বর্ণ এবং আরব ও আজমবাসীদের সাহস ও শৌর্যবীর্য আর দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে ভিন্ন দেশের জলবায়ুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, সে দেশের লোকদের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে এবং এতৎসংগে কষ্টকর জীবন ও দারিদ্র্যের চাপ সহ্য করে একটা জাতির পক্ষে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। একথা বলা হয়ে থাকে যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও ইংরেজগণ একই আর্য গোত্র থেকে উদ্ভূত। কিন্তু তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে একথা অনুমান করা কি সম্ভব যে তারা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত? আকাশ এবং মাটির মধ্যেকার পার্থক্যের মতো তাদের পার্থক্যও বিস্তর। বৃত্তি এবং পেশা-ও মানুষের দৈহিক আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন ঘটায়। লক্ষ্য করুন একজন শিকারীর দেহের রং ও আকৃতি রোদ-বৃষ্টিতে

অনাবৃত থাকার ফলে কেমন পরিবর্তিত হয়ে যায়। সর্বোপরি, দারিদ্র্যের প্রভাব সব চাইতে বেশী অনিষ্টকর। এ ক'টি কারণ সত্ত্বেও আরব ও আজমদের বংশধর বাংগালী মুসলমানদের দৈহিক গঠন ও আকৃতির সংগে এ দেশের হিন্দুদের দৈহিক গঠন ও আকৃতির একটা বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান এ দুটি জাতিভুক্ত লোকদের মধ্যে যারা সম-মর্যাদাসম্পন্ন ছিলো এবং একই বৃত্তির অন্বেষণ করতো তাদের মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করলেই এ পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে।

আসুন এখন আমরা ভাষার প্রমাণ সম্পর্কে বিচার করে দেখি। বাংলার মুসলমানদের কথ্য ভাষা ও এর শ্বাসাঘাত এবং তাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের কথ্য ভাষা ও শ্বাসাঘাতের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। এই মুসলমানদের কথিত বাংলা ভাষায় আরবী ও ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণ সুস্পষ্ট। বাংলার মুসলমানদের মূল যে বিদেশে, তাদের ভাষায় এই আরবী-ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণই তার পরিচায়ক; কেননা ধর্মের পরিবর্তনে ভাষার পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না। হিন্দুদের ধর্ম-পরিবর্তনই যদি এই মুসলমানদের উৎপত্তির কারণ হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই হিন্দুদের মতো একই ভাষায় কথা বলতো। অধিকন্তু, এই মুসলমানদের অভ্যাস ও রীতিনীতি তাদের হিন্দু দেশবাসীদের অভ্যাস ও রীতিনীতির চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এ সম্প্রদায় দুটির পুরুষ ও নারীগণ জীবনযাত্রা ও পেশায় যে নীতি অনুসরণ করে থাকে, তা নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করে দেখলেই এ পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হবে এ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ করে যে বাংলার জনসমষ্টির মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান শাখার অধিকাংশই আরবী, ইরানী, তুর্কী এবং আফগানী পূর্বপুরুষদের বংশধর।

সরকার মিঃ এইচ. এইচ. রিজলিকে বাংলার উপজাতি ও গোত্রগুলির একটি নৃকুলতত্ত্বমূলক জরিপ প্রস্তুত করার জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন ; সম্প্রতি তিনি একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন, যাতে তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই জাতিগত জরিপের কাজটি আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়ের (বাংলার মুসলমানদের উৎপত্তি) সংগে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে এর কিছু অংশ, যেখানে মুসলমানদের সম্পর্কে কথা আছে, এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি

পরিতাপের বিষয় এই যে এই সরকারী ভদ্রলোকটি বাংলার বিভিন্ন গোত্রের বৈজ্ঞানিক পরিমাপ নেয়ার সময় একটি মারাত্মক ও দুঃখজনক ভুল করেছেন, যদ্দ্বারা মুসলমানদেরকে সংশয়িত আলোকে স্থাপন করা হয়েছে। ভুলটি হলো এই : তিনি হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে এর সংগঠনের ক্রম অনুসারে আলোচনা করেছেন, এই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের বিভিন্ন পেশানুযায়ী বিভক্ত প্রতিটি বর্ণের জন্যে পৃথক পৃথক দৈহিক পরিমাপের ফলাফল নির্ধারণ করেছেন কিন্তু মুসলমানদের প্রসংগে তিনি তাদের বিভিন্ন গোত্র ও পেশার কথা বিবেচনা না করে পাইকারিভাবে আলোচনা করেছেন, সমগ্র সম্প্রদায়ের জন্য সাধারণভাবে একটিমাত্র সিদ্ধান্তকেই কার্যে পরিণত করেছেন ; অথচ এদেশের মুসলমানদের মধ্যে বহু গোত্র রয়েছে : যেমন—আরবী, ইরানী, তুর্কী, আফগানী ও অন্যান্য জাতির বংশধর ; হিন্দুস্তানের বিভিন্ন গোত্রের বংশধরেরাও আছে, যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো এবং এ-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন পেশাদার লোকও রয়েছে। সন্দেহ নেই যে পেশা মানুষের দৈহিক গঠনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ; কৃষিজীবী ও মাঠের শ্রমিকদের বেলায় একথা বেশী করে খাটে, যারা আবহাওয়ার

প্রভাবে বেশী পরিমাণে প্রভাবিত এবং বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাদের হার শতকরা ৬২-র চাইতেও বেশী। এমতাবস্থায় মিঃ রিজলি সমস্ত মুসলমানকে সামগ্রিকভাবে ধরে তাদের জন্যে একটি মাত্র সিদ্ধান্ত খুঁজে পেয়েছেন দেখে এবং তারপর হিন্দু সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক গোত্র সম্পর্কে তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার সংগে মুসলমান সম্পর্কিত একটিমাত্র সিদ্ধান্তের তুলনা করে আমরা তাঁর নকশাটির যাথার্থ সম্পর্কে সন্দেহ করছি। এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি নিশ্চয়ই অবিচার করা হয়েছে

প্রকৃতপক্ষে এদেশের মুসলমানদের উৎপত্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে ধারণা করা একরূপ অসম্ভব; অন্যান্য গোত্রের সংগে মুসলমানদের সংমিশ্রণের ফলে এবং জলবায়ু, ভূমি, খাদ্য ও জীবন যাত্রার ধরনের জন্যে এবং তাদের পেশা ও রীতিনীতি বশতঃ তাদের দৈহিক গঠনে অনেক পরিবর্তন সাধিত হলেও তাদের দেহ ও মুখাবয়ব, অভ্যাস ও রীতিনীতি সম্পর্কে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এই মুসলমানদের অধিকাংশই বিদেশী পূর্বপুরুষদের বংশোদ্ভূত। কোনো একটা পেশার অন্তর্ভুক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যক মুসলমানদের দৈহিক পরীক্ষার গড়পড়তা ফলের সংগে যদি ঐ একই পেশাধারী আরেকটি গোত্রের সমান সংখ্যক লোকের দৈহিক পরীক্ষার গড়পড়তা ফলের তুলনা করা যায় তাহলেই তা থেকে যথার্থ সিদ্ধান্ত পওয়া সম্ভব। কিংবা যদি মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়গুলির প্রত্যেকটি যথাযথ-ভাবে শ্রেণী অনুসারে বিভক্ত করা যায় এবং তারপর এক সম্প্রদায়ের কোনো এক শ্রেণীর লোকদের তুলনা করা যায়, তাহলে সম্পূর্ণরূপে সঠিক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে।

রিজলি সাহেবের নৃতাত্ত্বিক জরিপের ফলাফল, যা তিনি ইংল্যাণ্ডের Ethnological Society-তে পেশ করেছেন, ১৮৯০ সালের ১৫ই

সেপ্টেম্বরের Oudh Akhbar-এ এভাবে সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে—

> মানুষের দৈহিক পরিমাপ ও নৃতাত্ত্বিক পরীক্ষা বাংলাদেশে দুটি স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করে ; এগুলির একটির নাম আর্য ও অপরটি আদিম অধিবাসী। ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও শিখেরা প্রথমোক্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারা সাধারণতঃ দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ ও সুন্দর নাসিকার অধিকারী এবং তাদের সাধারণ চেহারা ইউরোপের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চাইতে উৎকৃষ্টতর। শেষোক্ত জাতির নমুনা হলো কোল। তারা খর্বাকৃতিবিশিষ্ট, মলিন গাত্রবর্ণ ও থাঁদা নাকের অধিকারী এবং চেহারায় আফ্রিকার নিগ্রোদের কাছাকাছি। প্রসিদ্ধ নৃতাত্ত্বিক-দের সকলেই নাসা-সম্বন্ধীয় নির্দেশকের বিচারকে খুব মূল্যবান গোত্র বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করেন এবং ভারতবর্ষে যে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে তাতেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। বাংলার জাতি ও গোত্রগুলি এলোমেলো ও মিশ্রিত। নাকের বর্ধিত চেপ্টা ভাবের সমানুপাতে একটি জাতির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। একটি লোকের জন্ম যত নিম্নতর বংশে হবে তার নাক ততই চেপ্টা হবে, আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে যেমনটি দেখা যায় ; তার জন্ম যত উচ্চতর বংশে হবে, ততই সে চেহারার দিক দিয়ে ইউরোপবাসীদের অনুরূপ হবে।

ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও শিখেরা যে আর্য জাতির প্রতীক, মিঃ রিজলির এ বিবরণ আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে শিখেরা কোনো নির্দিষ্ট জাতি নয়, কিংবা শিখ শব্দটির

দ্বারা যে সমস্ত লোকেরা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাদের মধ্যে নৃকুলতত্ত্বমূলক সাদৃশ্যের কথা কোনো মতেই প্রকাশ করে না। আর্য বংশেরই হোক কিংবা অনার্য বংশেরই হোক, যে ব্যক্তি বাবা নানকের প্রচারিত মতবাদকে গ্রহণ করেছে তাকেই শিখ বলা হয়। শব্দটি একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের নাম, কোনো একটি নির্দিষ্ট গোত্র বা শাখা গোত্রের নাম নয়। 'শিখ' একটি পাঞ্জাবী শব্দ, যার অর্থ 'শিষ্য'। এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাবা নানক তাঁর শিষ্যদেরকে এ নামেই সম্ভাষণ করতেন। এই শিষ্যগণ তাদের বংশধরদের দ্বারা 'গুরুকে শেখ' অর্থাৎ 'ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার শিষ্য' বলে অভিহিত হতো। যে কোনো লোক, তা সে উচ্চ বংশেরই হোক কিংবা নীচ বংশেরই হোক, প্রাথমিক আচারাদি নিষ্পন্ন করেই একজন শিখ-এ পরিণত হতে পারে; এই প্রাথমিক আচারকে তারা 'পহেল' বলে থাকে তাদের এই ধর্মাচার পদ্ধতি নিম্নরূপ: জলে বাতাসা ভেংগে শরবত প্রস্তুত করা হয়; এই শরবতের মধ্যে গুরু কিংবা পুরোহিত তাঁর ডান পায়ের আংগুল চোবান; তারপর তিনি তাতে একটি নাংগা তলোয়ারের অগ্রভাগ রাখেন। অতঃপর তিনি নিজে সেই শরবতের কিয়দংশ পান করেন এবং বাকী অংশ নব দীক্ষিত শিষ্যকে পান করতে দেন ও শরবতের কিছু অংশ তার মুখের ওপর ছিটিয়ে দেন। একই সময়ে তিনি তাঁদের দশম গুরু গোবিন্দ সিং কর্তৃক নির্ধারিত অনুশাসন সম্পর্কে তাকে উপদেশ দেন এবং ঐ সমস্ত অনুশাসন ঠিকভাবে পালনের দায়িত্বভার তার ওপর ন্যস্ত করেন। গুরু নানক থেকে গুরু গোবিন্দ সিং পর্যন্ত শিখ ধর্মমতের দশজন গুরু ছিলেন। এই গুরুদের সকলেই ছিলেন খত্রি সম্প্রদায়ভুক্ত।

প্রদেশগুলির বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে 'মখযান-ই-পাঞ্জাব' নামক ইতিহাস গ্রন্থে নিম্নরূপ বর্ণনা আছে—

> একথা জানা যায় যে শিখেরা পাঞ্জাবের উত্তর ও পূর্বাংশে প্রাধান্য লাভ করেছে। শিখদের এই অধিকতর প্রতিপত্তির প্রধান কারণ হলো এদেশ বহুদিন যাবৎ শিখদের শাসনাধীনে ছিলো এবং এসময়ে তারা যে শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করতে পেরেছিলো তাই অধিকাংশ হিন্দুকে শিখ ধর্ম গ্রহণে প্রলুব্ধ করেছিলো; এমন কি মেথর ও ঝাড়ুদারগণও 'পহেল' (শিখধর্মে দীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান) গ্রহণ করতো এবং 'ধরংধরেতি শিখ' বলে অভিহিত হতো। এ ধর্মবিশ্বাসের অনুসারীদের মধ্যে প্রতিটি বর্ণের হিন্দুই ছিলো। কিন্তু যে ধরনের লোকই হোক না কেন 'পহেল' ধর্মানুষ্ঠান পালন করার পর তার পূর্ব জাতীয়তা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতো এবং একজন শিখরূপেই সে পরিচিত হতো।

একইরূপে রাজপুত উপজাতির মধ্যেও মুসলমান এবং হিন্দু উভয় জাতির লোকই রয়েছে। এই উপজাতির যারা তাদের পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অনুগত রয়েছে এবং যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে কিংবা যারা মুসলমানদের বংশধর, তারা সকলেই রাজপুত। পাঞ্জাব প্রদেশে অসংখ্য মুসলমান রাজপুতও আছে

বস্তুতঃ রিজলি সাহেব মুসলমানদের ওপর খুব বড় রকমের অবিচার করেছেন। 'The Tribes and Castes of Bengal' নামে অভিহিত তাঁর গ্রন্থটিতে এদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় ও জাতির নাকের গড় উচ্চতা ও বিস্তারের নিম্নলিখিত

পীঠিকা রয়েছে—

বাংলার উপজাতিগুলির নাম		নাকের গড় উচ্চতা	নাকের গড় বিস্তার
ব্রাহ্মণ	...	৪৯·৭	৩৫
মুসলমান	...	৪৯·৪	৩৮·৩
কায়স্থ	...	৫০·২	৩৫·৩
বাগ্‌দী	...	৪৬·৭	৩৭·৯
বাউরী	...	৪৬·৬	৩৬·৭
চণ্ডাল	...	৯৬·২	৩৬·৭
গোয়ালা	...	৪৯	৩৬·৪
কৈবর্ত	...	৪৮	৩৬·৬
মালী	...	৪৫·৯	৪১·৫
মাল বেহারী	...	৪৪·১	৪১
মুচি	...	৪৯·১	৪১
পোদ	...	৪৯·১	৩৬·৮
রাজবংশী	...	৪৮·৯	৩৭·৫
সদ্‌গোপ	...	৪৫·৬	৩৭·৭

এই পীঠিকা অনুসারে ব্রাহ্মণদের নাকের গড় উচ্চতা ৪৯·৭ এবং গড় বিস্তার ৩৫, কিংবা উচ্চতা বিস্তারের ১৪·৭ অধিক; এবং মুসলমানদের নাকের গড় উচ্চতা দেয়া হয়েছে ৪৯·৪ এবং বিস্তার ৩৮·৩; এস্থলে উচ্চতা বিস্তারকে ১১·১-এ ছাড়িয়ে গেছে। হিন্দুদের বেলায় বিভিন্ন বর্ণকে আলাদাভাবে ধরে এবং মুসলমানদের বেলায় কোনো রকম শ্রেণী বিভাগ না করে সকল মুসলমানকে একটি জাতি ধরে এদের নাকের উচ্চতা স্থির করার ফলেই এ জাতি দুটির নাকের উচ্চতার আধিক্যের মধ্যে এ পার্থক্য দেখা দিয়েছে।

আমরা যদি পূর্ব পৃষ্ঠার গীঠিকায় উল্লিখিত ১১টি হিন্দু বর্ণের ১১ জন লোকের নাকের উচ্চতা ও বিস্তারের গড় করি : যেমন—(১) ব্রাহ্মণ, (২) কায়স্থ, (৩) বাগ্‌দী, (৪) বাউরী, (৫) চণ্ডাল, (৬) গোয়ালা, (৭) কৈবর্ত্ত, (৮) মালী, (৯) মুচি, (১০) পোদ, (১১) রাজবংশী, (১২) সদ্‌গোপ এবং এ গ্রন্থে প্রদত্ত সংখ্যা অনুযায়ী একইরূপে ১২ জন বিভিন্ন মুসলমানের নাকের উচ্চতা ও বিস্তারের গড় করি, তাহলে হিন্দুদের নাকের গড় উচ্চতা হবে ৪৭.৮ ও বিস্তার হবে ৩৬.৫ ; অর্থাৎ উচ্চতা বিস্তারকে ১১.১-এ ছাড়িয়ে যাবে এবং মুসলমানদের নাকের গড় উচ্চতা ও বিস্তার হবে যথাক্রমে ৫০.২ ও ৩৮.৮ ; এ ক্ষেত্রে নাকের উচ্চতা বিস্তারকে ১১.৪-এ ছাড়িয়ে যাবে। ইহা লক্ষণীয় যে প্রদত্ত সংখ্যার গড় নির্ণয়ে সামান্য পরিবর্তন সম্পূর্ণ নতুন ফলের দিকে মোড় নেবে।

আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে গ্রন্থটিতে প্রশ্নস্থলে কেবল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মাপ-জোখের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের আধিক্য আরো বেশী করে প্রতীয়মান হয় যখন দেখি যে সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র ১৮৫ জন মুসলমান প্রজাকে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ সংখ্যার মধ্যে ২৭ জন চট্টগ্রামে, ৫৭ জন ময়মনসিংহে, ১৩ জন ত্রিপুরায়, ৩৮ জন ঢাকায়, ৩৩ জন ফরিদপুরে এবং অবশিষ্ট ১৭ জন বরিশাল নোয়াখালি ও পাবনা জেলায় পরীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু প্রজাদের ব্যাপারে বলতে গেলে তাদেরকে বাংলার পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সমস্ত জেলাতে সমান সংখ্যায় পরীক্ষা করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে উল্লেখিত প্রজাদের নামগুলি এ সন্দেহের উদ্রেক করে যে কেবলমাত্র নিম্নতম সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে ; এবং এ ব্যাপারে আমি আমার নিজেকে সংশয়মুক্ত

করার জন্যে উক্ত বিষয় সম্পর্কে হাসপাতালের সহকারী বাবু কুমুদ বিহারী সামন্তকে পুংখানুপুংখরূপে প্রশ্ন করেছিলাম। এই ভদ্রলোক রিজলি সাহেবের কাজের সময় তাঁকে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর ওপর বাংলাদেশস্থ প্রজাদের নৃতাত্বিক মাপজোখের কাজের দায়িত্বভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়েছিলো। আমি তাঁর নিকট জানতে পারি যে তিনি ইচ্ছা করেই উচ্চবংশজাত, সম্মানযোগ্য ও মর্যাদাসম্পন্ন মুসলমানদের মাপজোখ গ্রহণ করেননি, কেবলমাত্র নিম্নতম শ্রেণীর মুসলমানদের মাপজোখই গ্রহণ করেছেন। এর কারণ সম্পর্কে সামন্ত মহাশয় বলেন যে পূর্ব বংলার কেবলমাত্র নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের পরিমাপ নেয়ার জন্যে এবং তারা যে নিয়মিত মুখাবয়বের অধিকারী তার দৈহিক পরিমাপ পরীক্ষা না করার জন্যে কিংবা পরীক্ষা করলেও তিনি যাতে তা রেকর্ডভুক্ত না করেন তার জন্যে রিজলি সাহেব স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি পূর্ব বাংলার কয়েকটি কারাগার পরিদর্শন করেন এবং ঐ সমস্ত কারাগারের কয়েকজন কয়েদীর পরিমাপ নিয়ে সেগুলি রিজলি সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দেন, যিনি পরিশেষে সেগুলি তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন

একচেটিয়াভাবে পূর্ব বাংলার নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা এবং এমন কি তাদের মধ্যে যারা সুষম মুখাবয়বের অধিকারী ছিলো তাদের পরিমাপ রেকর্ডভুক্ত না করার জন্যে রিজলি সাহেব যে আদেশ দিয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ও অদ্ভুত ব্যাপার। কুমুদ বাবু নিজেই বলেছেন যে রিজলি সাহেবের উক্ত আদেশের ধরন তাঁর নিকট দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত ছিলো। এমতবস্থায় মুসলমানদের সম্পর্কে রিজলি সাহেবের ধারণাকে কিভাবে ন্যায়সংগত এবং তাদের প্রতি অনুকূল বলা চলে? এবং তাঁর

গ্রন্থে লিপিবদ্ধ মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর নৃতাত্ত্বিক ও মানব-জাতি বিষয়ক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার ফলাফলকে কি ভাবে নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য বলা চলে?

যাহোক, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলি যে যাবতীয় টেকনিক্যাল ও বৈজ্ঞানিক বিচার ছেড়ে দিলেও সামান্যতম বিচার-বিবেচনার অধিকারী যে কোনো লোক উপলব্ধি করতে পারেন যে, বাংলার মুসলমানদের অধিকাংশই দেশের অন্যান্য জাতির চাইতে দৈহিক গঠন, মুখাবয়ব ও গাত্রবর্ণের দিক দিয়ে উত্তম; অন্য কথায় রিজলি সাহেবের মতানুযায়ী 'দীর্ঘ দেহ, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ, সুন্দর নাক ও মোটামুটি সুশ্রী মুখমণ্ডল' যদি একটি উৎকৃষ্টতর জাতির লক্ষণ হয়ে থাকে তাহলে একই শ্রেণীর হিন্দুদের চাইতে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেই সেগুলির সাক্ষাৎ অধিক পরিমাণে মিলবে। যে নাসিকা-পরিচিতিকে জাতি-বৈশিষ্ট্যের সর্বাধিক মূল্যবান পরিচায়ক বলে বিবেচনা করা হয় সেই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা মনে করি যে এদেশের অনার্যদের নাক প্রশস্ত, ক্ষুদ্র ও মোটা; পরন্তু অধিকাংশ মুসলমানের নাক সরু, উন্নত ও খাড়া। মোট কথা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের নাক একই মর্যাদাসম্পন্ন হিন্দুদের নাকের চাইতে সাধারণতঃ বেশী সুন্দর; এবং একইরূপে মুসলমানদের নিম্নতর সম্প্রদায়ের নাক সমপর্যায়ের হিন্দু সম্প্রদায়ের নাকের চাইতে উত্তম। এ দুটি জাতির কেবল নাকের পরীক্ষা থেকেই একথা প্রমাণিত হবে যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমান বাংলার আদিম জাতি ও উপজাতির বংশধর নয়।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলির বিবরণ

বাংলার সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারদের ইতিহাস বর্ণনা করা খুবই কঠিন। কারণ, অধিকাংশ পরিবারই এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে যে ঐ সমস্ত পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত তাদের নিজেদের কুল এবং তাদের পূর্বপুরুষদের বিস্তারিত বিবরণের কথা খুব সামান্যই জানে। অজ্ঞতা এবং দারিদ্র্য তাদেরকে এতো বেশী নিম্ন পর্যায়ে এনেছে যে তারা এখন জনসমুদ্রের সংগে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আবার, কোনো কোনো উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রধান ব্যক্তিরা প্রায়ই রাষ্ট্র-বিপ্লব বা সরকারের আমূল পরিবর্তনের সময় তাদের প্রাণরক্ষার জন্যে দেশের দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে পলায়ন করেছিলেন; সেখানে তারা তাদের পরিচয় গোপন করে অন্ধকারের মধ্যে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। কেবল মোগল আধিপত্য বিস্তারের সময়েই নয়, প্রতিটি সরকারের পরিবর্তন উপলক্ষে, ঐ বিশিষ্ট সময়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়কালেই এ নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। ঐ সমস্ত শরণার্থীর বংশধরগণ সাধারণতঃ দীর্ঘকাল যাবৎ এমন হীন অবস্থায় জীবনযাপন করেছে যে, এ পরিবর্তিত অবস্থাই অবশেষে তাঁদের পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবারস্থ লোকদের ক্রমবর্ধমান অজ্ঞতার জন্যে অনেক পরিবারই ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে।

যে সমস্ত পরিবার উপরোল্লিখিত কারণগুলির ধ্বংসাত্মক পরিণামের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, বাংলা দেশে তাদের সংখ্যা এখনো অনেক। আমরা তাদের সবগুলির নাম করতে অসমর্থ। তার কারণ এই যে (১) তাদের সবগুলি আমাদের নিকট পরিচিত নয়; (২) আর তাদের সংখ্যা এতো বেশী যে কেবল তাদেরকে নিয়ে একটি তালিকা প্রস্তুত করতেই একখানি গ্রন্থ পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে আমরা ব্যাখ্যার সাহায্যে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও সুপরিচিত পরিবারের বিস্তারিত বিবরণ দেবো।

সর্বপ্রথমেই একথা জানা প্রয়োজন যে চারটি প্রধান বংশ—যথা: (১) সৈয়দ, (২) শেখ, (৩) মোগল এবং (৪) পাঠান—এ দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে গঠন করেছে বলে বিবেচনা করা হয়।

(১) সৈয়দ বংশ—এ বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে অপর তিনটি বংশের চাইতে শ্রেষ্ঠ এবং সাধারণতঃ সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানের অধিকারী। এ সম্ভ্রান্ত বংশ দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত—একটি হলো বনি ফাতেমীয় সৈয়দের শাখা এবং অপরটি হলো উলভি বনি ফাতেমীয় সৈয়দের শাখা। যাঁরা ইমাম হাসান অথবা হোসেনের (তাঁদের ওপর আল্লার শান্তি বর্ষিত হোক) বংশধর, অর্থাৎ যাঁরা হযরত আলী এবং তাঁর স্ত্রী পুণ্যাত্মা বিবি ফাতেমার (তাঁদের ওপর আল্লার রহমত বর্ষিত হোক) বংশধর, তাঁদেরকে বলা হয় ফাতেমীয় সৈয়দ উলভি সৈয়দ তাঁদেরকেই বলা হয়, যাঁরা (হযরত) আলীর ঔরসে বিবি ফাতেমাকে ছাড়া তাঁর অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বংশধর। উলভি সৈয়দের তুলনায় ফাতেমীয় সৈয়দেরা মর্যাদার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর, কেননা তাঁরা বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বংশধর। আবার, সৈয়দদের ফাতেমীয় শাখার কয়েকটি প্রশাখা

রয়েছে, যেগুলির প্রত্যেকটি একজন একজন করে বারো জন ইমামের (তাঁদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) নামে অভিহিত, কিংবা আরো বেশী সঠিকভাবে বলতে গেলে একথা বলা চলে যে, এ সমস্ত ইমামের প্রত্যেকের বংশধরদের পরিবার তাঁর নিজের নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন—হোসেনি সৈয়দ, হাসানি সৈয়দ, মুসাবি সৈয়দ, রযভি সৈয়দ, কাযেমি সৈয়দ, তকভি সৈয়দ, নকভি সৈয়দ এবং এ ধরনের আরো অনেক প্রশাখা আছে। একইরূপে কোনো কোনো সৈয়দ তাঁদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের নামানুসারে তাঁদের বংশের নামকরণ করেছেন ; যেমন—যায়েদি, ইসমাইলি, তবতবাই কাদরি ইত্যাদি। কোনো কোনো পরিবার যে স্থানে বাস করেন সে স্থানের নামেই তাঁদের নামকরণ হয়েছে ; যেমন বোখারি, কিরমানি, তবরেকি, শবযাওয়ারি ইত্যাদি। যে সমস্ত সৈয়দ তাঁদের পিতা ও মাতার দিক দিয়ে (হযরত) হাসান ও হোসেনের বংশধর তাঁরা হাসানি-উল-হোসেনি হিসেবে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ এবং সৈয়দ বংশের অবশিষ্ট সকল শাখা ও পরিবারের চাইতে মান ও মর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়।

(২) কোরাইশি শেখ—এ বংশ খুব বেশী সম্মানীয়, কেননা আল্লার রসুল (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) এ বংশেই জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন, যা থেকে কোরেশি শেখদের উৎপত্তি হয়েছে। এ বংশ কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে ; প্রতিটি শাখা সাহাবির (অথবা রসুলের সংগী) নাম ধারণ করেছে, যে সাহাবির বংশ থেকে শাখাটি উদ্ভূত হয়েছে ; যেমন উদাহরণস্বরূপ সিদ্দিকি, ফারুকি, আসমানি, আব্বাসি, খালেদি এবং এ ধরনের আরো পদবীর উল্লেখ করা যেতে পারে। সৈয়দ এবং কোরায়শি শেখ এ উভয় বংশের উৎপত্তিই হলো আরব দেশে। ইরান, আফগানিস্তান ও খোরাসানের

মহান সিদ্ধপুরুষ, বিখ্যাত আলেম ব্যক্তি এবং যশস্বী ধর্ম-শাস্ত্রবিদগণও শেখ এই বিশেষ নামে অভিহিত।

(৩) মোগল—ইহা মংগোলিয়ান জাতি; চেংগিজ খান এ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। এ জাতির লোকেরা ছিলো মূলত: প্যাগান ধর্মাবলম্বী। কিন্তু চেংগিজ খানের পৌত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর এ জাতির বহু লোক তাদের রাজার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করে এ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। চাঘতাই বংশের সকল রাজাই ছিলেন মুসলমান। ভারতবর্ষে মোগল আধিপত্য বিস্তারের জন্যেই এ জাতি ভারতীয় জনসমষ্টির মধ্যে অত্যাধিক সংখ্যায় প্রবেশ করেছে। এই মোগলবংশীয় লোকদের মির্যা কিংবা বেগ পদবী আছে। এ জাতীয় বহু শাখা ও প্রশাখা রয়েছে।

(৪) পাঠান—ইহা আফগান বংশ এবং এর আদি বাসস্থান ছিলো আফগানিস্তান। পাঠানেরা দীর্ঘকালের জন্যে ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে এ বংশের লোকেরা অত্যাধিক সংখ্যায় এ দেশের ওপর পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তাঁরা 'খান' নামে অভিহিত। এ বংশেরও বহু শাখা এবং প্রশাখা রয়েছে।

এখানে আরো কিছু বলা প্রয়োজন যে, এদেশের আদিম জাতিভুক্ত যে সমস্ত লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তারা ভদ্রতার খাতিরে শেখ, খান কিংবা মালিক নাম গ্রহণ করেছে।

উপরোল্লিখিত চারটি মূল বংশের একটা মোটা অংশ বাংলার মুসলমান জনসংখ্যায় রয়েছে। বাংলার মুসলমান জনসংখ্যা সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান বংশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সমন্বয়ে গঠিত; অর্থাৎ আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে এদেশে সৈয়দদের মধ্যে রয়েছে হাসানি-উল-হোসেনি, হাসানি, হোসেনি, রযভি, মুসবি,

নকভি, তকভি, যায়েদি, ইসমাইলি, তবতবাই, উলভি, বোখারি, কিরমানি, শবযাওয়ারি ইত্যাদি; শেখদের মধ্যে রয়েছে সিদ্দিকি, ফারুকি, ওসমানি, আব্বাসি, খালেদি, হারেসি ইত্যাদি; আর রয়েছে মির্যা, বেগ ও খানেরা, অর্থাৎ মোগল এবং পাঠান বংশের লোক।

শ্রদ্ধাস্পদ ও সম্ভ্রান্ত সৈয়দ ও শেখগণ গৌড়ের রাজাদের আমলে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারে নিজেদেরকে নিযুক্ত রেখেছেন। তাঁরা গৌড়ের রাজদরবার কর্তৃক আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে শ্রদ্ধা পেয়েছেন এবং শাহ্ ও খন্দকার উপাধি দ্বারা বিশেষভাবে অভিহিত হয়েছেন। বর্তমানকাল পর্যন্ত তাঁদের বংশধরগণ এই ধর্মীয় উপাধিগুলি বহন করছেন। খন্দকার পদবীটির ব্যবহার কেবল এ দেশেই সীমাবদ্ধ। গৌড়ের শাসনামল থেকেই এখানে শ্রদ্ধাস্পদ ধর্মীয় নেতা ও তাঁদের বংশধরদের পদবী দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিলো। মোগল ও পাঠানদের মধ্যে 'মালিক' নামে একটি শ্রেণী আছে; প্রধানতঃ ঘোরি ও খিলজি আমিরগণই (সর্দার ও অভিজাত ব্যক্তিগণ) এই বিশেষ উপাধিটির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই আমিরগণ কোনো কোনো সময় হিন্দু ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদেরকে তাঁদের নিজেদের পদবী দানে সম্মানিত করতেন এবং নিজেদের মতো তাঁদেরকেও 'মালিক' বলে অভিহিত করতেন। তখন থেকেই এই হিন্দু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ও তাদের বংশধরগণ ঐ পদবী বহন করে আসছে। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত অন্য বহুজাতি এবং তাদের বংশধরগণ একইরূপে শেখ এবং খান নামে পরিচিত। শেখ, খান এবং মালিক নামে অভিহিত শ্রেণীগুলির মধ্যে সদ্বংশজাত এবং নীচ বংশজাত উভয়বিধ লোকই রয়েছে। কাযি ও চৌধুরি নামে অভিহিত শ্রেণীগুলি শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান এ চারটি বিদেশী বংশের যে কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের

এ গোত্র নাম ধারণ করার কারণ এই যে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কেউ হয়তো কোনো সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অনুরূপ পদবী লাভ করেছিলেন। এদেশে কিছু সংখ্যক মুসলমান আছেন, যাঁরা খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত হয়েও মর্যাদার খাতিরে 'ঠাকুর' নামে অভিহিত, যা হিন্দুদের নেতৃস্থানীয় লোকদের বিশিষ্ট উপাধি। অপর পক্ষে যে সমস্ত হিন্দুর পূর্বপুরুষেরা ঠাকুর, বিশ্বাস এবং এ ধরনের পদবীর অধিকারী ছিলো, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও তারা তাদের পুরণো কুল-নাম পরিত্যাগ করেনি এবং তাঁদের বংশধরগণও অদ্যাবধি সে নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। এদেশের অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কয়েকটি পরিবার আছেন যাঁরা এমন কি আদম (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) পর্যন্ত তাঁদের বংশ-পীঠিকা অনুসরণ করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে এমন অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকও রয়েছেন, যাঁরা পূর্বপুরুষদের এমন একটি পরিবার থেকে উদ্ভূত, যার পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পক্ষই সমানভাবে উচ্চ বংশোদ্ভূত এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডীর বাইরে কখনো যাঁদের অসবর্ণ বিয়ে হয় না, কিংবা যে কোনো অবস্থায় যাঁরা অসম সম্পর্ক স্থাপন করেন না।

বাংলার চারটি পুরনো বিভাগ, যথা—রাঢ়, বরেন্দ্র, বগ্রি ও বংগ দেশের মধ্যে প্রথম ও শেষ বিভাগে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় অধিক পরিমাণে বাস করেন এবং অবশিষ্ট দুটি বিভাগে সাধারণ লোকেরা বাস করে থাকে। আবার, ঘোরি ও খিলজি রাজ-বংশের শাসনামলে মুসলমানদের বংশধরগণ রাঢ় ও বরেন্দ্র বিভাগে প্রাধান্য লাভ করেছিলো এবং মুসলমান আগন্তুকদের বংশধরগণ মোগলদের আমলে বংগদেশ ও বগ্রিতে প্রাধান্য লাভ করেছিলো। পূর্বোক্ত মুসলমানগণ প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে বসবাস

করে এবং শেষোক্ত মুসলমানগণ প্রধানতঃ নগর ও সহরগুলিতে এবং এগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। অধিক সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ-পরিবারগুলি গ্রামে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে থাকেন ; এর কারণস্বরূপ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আগেকার দিনে সরকারের পরিবর্তনজনিত বিপ্লবের ফলে নগর ও সহরগুলিতে নানাবিধ বিপদের আশংকা বিরাজ করতো ; সেগুলি প্রায়ই দুঃখজনক ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে পরিণত হতো ; তাছাড়া তখন শাসক-গোষ্ঠী ভদ্র ও অভিজাত সম্প্রদায়কে যে সমস্ত 'আয়মা' ও 'মদদ-ই-ম'আশ' এবং তদ্রূপ অন্যান্য দান মঞ্জুর করতেন সেগুলি সাধারণতঃ গ্রামাঞ্চল থেকেই ধার্য করা হতো ; সুতরাং দানগ্রহীতাকে সে সমস্ত অঞ্চলে তাঁদের সম্পত্তিতে বাস করার উদ্দেশ্যে যেতে হতো। এ ধরনের ব্যবস্থা কেবলমাত্র বাংলা দেশেই প্রচলিত ছিলো না, হিন্দুস্তানের সর্বত্রই সাধারণভাবে এ ব্যবস্থা চালু হয়েছিলো। এ ব্যবস্থা বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারকে ভারতের সর্বত্র বসবাস করার সুযোগ দান করে।

আমরা এখন সংক্ষেপে বাংলা দেশের কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরিবারের বিস্তারিত বিবরণ দেবো। সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রান্ত ও সর্বোত্তম পরিবার হলো মুর্শিদাবাদের নওয়াব নাযিম পরিবার, যা অতুলনীয় না হলেও সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অন্য কোন পরিবারই একে অতিক্রম করতে পারেনি। এই মহান পরিবার হাশানি-উল-হোসেনি সৈয়দের তবতবাই শাখার অন্তর্ভুক্ত। এ পরিবারের জ্ঞাতি শাখাগুলি যখন যেখানেই বাস করেছে, তখন সেখানেই তারা নিয়ত একইরূপে ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে এবং সর্বত্র সাধারণ সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ পরিবারের উন্নততর আভিজাত্যের মর্যাদা এর ততোধিক পরিমাণে বিশিষ্ট মূলের উচ্চ মর্যাদার সমতুল্য।

এ পরিবারের বর্ণনা 'তারিখ-ই মানসুরি' গ্রন্থের 'উমদাতুল তালেব ফি আনসাবি আল-ই-আবি তালেব' এ বিস্তারিত ভাবে দেয়া হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ নগরে ও এর আশেপাশে শেখ, মোগল ও পাঠান বংশের বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার বসবাস করে থাকেন। মফস্বলের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফতেহ্ সিং, সুন্তি ও বেলঘাটিয়ার সৈয়দ, ফতেহ্ সিং-এর খন্দকার এবং কাযী ও চৌধুরিও তাঁদের সদ্বংশের জন্যে বিখ্যাত; তাঁদের পরিবার খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্মানীয়। এতদ-অঞ্চলের খন্দকারগণ ইসলামের প্রথম খলিফা আবুবকরের প্রাচীনতম ও সম্মানীয় পরিবারের বংশধর। তাঁদের পূর্বপুরুষ কাযী শেখ সেরাজুদ্দিন গৌড়ের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে আগমন করেন; পরে তিনি গৌড়ের রাজধানীতে কাযি-উল-কুয্যাত বা প্রধান বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এ পরিবার পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় পক্ষ থেকেই উন্নত বংশজাত বলে বিশেষভাবে খ্যাত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ৭৬৯ হিজরি থেকে ৭৭৫ হিজরি পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

বীরভূম জেলায় যে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছে তা সৈয়দ, শেখ ও পাঠানদের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁদের মধ্যে খুশতিগিরি, দমদমা, নওয়াদাহ্, হযরতপুর, সুরগাঁও, মাজগাঁও ইত্যাদি এলাকার সৈয়দ, শেখ ও চৌধুরি এবং নগর ও অন্যান্য অঞ্চলের পাঠানগণ খুবই প্রসিদ্ধ। খুশ্তিগিরি ও অন্যান্য অঞ্চলের সৈয়দগণ অত্যধিক সম্মানীয় বংশের লোক এবং তাঁদের পরিবারগুলি প্রাচীনকালের মহান সভ্যতার অধিকারী। তাঁদের সকলের সাধারণ পূর্বপুরুষ ৮৯৯ হিজরিতে গৌড়ের সুলতান ফিরোয শাহের রাজত্বকালে এদেশে আগমন করেন; তাঁদের পূর্বপুরুষগণ সর্বদাই সম্মান ও মর্যাদাজনক পদ অধিকার করেছিলেন।

বর্ধমান জেলার অসংখ্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে জাফরাবাদ, রায়গাঁও, চংবরিয়া, বাবা ইত্যাদি অঞ্চলের সৈয়দগণ, সমশার, সায়ের, মুরগাঁও, কাসিয়ারাহ্ ইত্যাদি অঞ্চলের খন্দকারগণ এবং মংগলকোট, ঝিলু, আরল, কেওগাঁও ও অন্যান্য অঞ্চলের শেখগণ খুবই সম্ভ্রান্ত ও প্রসিদ্ধ।

মেদিনিপুরের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সৈয়দ এবং পাঠানগণ খুবই প্রসিদ্ধ।

২৪-পরগণা জেলার মধ্যে কলকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর মুসলমান এখানে এসে জমায়েত হয় এবং রাজধানীর জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে; তাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত ও বিশিষ্ট পরিবারের মুসলমান রয়েছে। মফস্বলেও বহু সদ্বংশজাত এবং সম্মানীয় পরিবারের মুসলমান বাস করছেন।

নদিয়া জেলার সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বামনপুকুরের খন্দকারগণ, যেতই, মেহেরপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের সৈয়দ ও খন্দকারগণ তাঁদের বিশিষ্ট বংশের জন্যে প্রসিদ্ধ।

রাজশাহী জেলার মধ্যে বগুড়ার ও নাটোরের খন্দকারগণ তাঁদের সম্ভ্রান্ত বংশের জন্যে খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁরা আব্বাসি শেখ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং খলিফা হারুন-অর-রশিদের বংশধর। এদেশে তাঁদের পরিবার খুবই প্রাচীন। এ পরিবার গৌড়ের সুলতানদের শাসনামলে এদেশে আগমন করেন এবং সর্বদাই উচ্চ শ্রদ্ধা ও যথেষ্ট সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁদের পূর্বপুরুষ খন্দকার মঈনুল ইসলাম, খন্দকার বদরুল ইসলাম ও খন্দকার রফি-উল ইসলাম অপরের চাইতে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদার অধিকারী হন এবং তাঁদের সময়ে তাঁরা ছিলেন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। গৌড়ের

সুলতানদের সম্পর্কে বর্ণিত বাংলার বিভিন্ন ইতিহাসে তাঁদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। নাটোর ও অন্যান্য অঞ্চলের পাঠানগণও খুবই প্রসিদ্ধ।

মালদহ জেলায় সৈয়দ ও পাঠানগণ তাঁদের উত্তম পরিবার ও সম্মানীয় বংশের জন্যে খুবই প্রসিদ্ধ।

ঢাকা শহর এবং এর চারিপার্শ্বস্থ এলাকায় মুসলমানদের সৈয়দ, শেখ, কাযি এবং অন্যান্য বংশের ও শাখার বহু সম্মানীয় ও সম্ভ্রান্ত পরিবার বসবাস করেন।

ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, যশোহর, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি ও কুমিল্লা জেলায় সৈয়দ, শেখ, পাঠান ইত্যাদি বংশের বহু সম্ভ্রান্ত ও উত্তম পরিবার রয়েছে; সিলেট এবং এর সংলগ্ন জেলাগুলিতেও তদ্রূপ মুসলমান বসবাস করছেন। চট্টগ্রাম এবং এর সংলগ্ন জেলাগুলিতেও একইরূপে বহুসংখ্যক সম্মানীয় ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার রয়েছে। উপরোক্ত মুসলমান পরিবার ছাড়াও বাংলা দেশে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত, উচ্চ, সম্মানীয় ও প্রাচীন মুসলমান পরিবারের অস্তিত্ব বিদ্যমান, যা গণনার অতীত। কিন্তু এ বিষয়ের ওপর আমার সীমিত তথ্য এবং এ অধ্যায়ের অপরিসর পরিধি এখানে তাঁদের সম্পর্কে যে কোনো স্বতন্ত্র আলোচনার বাধাস্বরূপ দাঁড়িয়েছে, যে ত্রুটির জন্যে আমি পাঠকবর্গের ক্ষমা পাবো বলে আশা করি।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমানদের পেশা

সদ্বংশজাত মুসলমান, অর্থাৎ আরব, তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানে জাত সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠানদের মধ্যে প্রাচীন ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী জীবিকার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সম্মানজনক উৎস ছিলো, তাদের মতে, তরবারি ও কলমের পেশা এবং ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় ও আদায়কৃত অর্থাদি। জীবিকা অর্জনের এ দুটি উৎস ব্যতীত অন্য সমস্ত পেশা এবং যাবতীয় হস্তশিল্প ও দোকানদারিকে তারা তাদের উচ্চপদ ও মর্যাদার পক্ষে অপমানজনক বলে বিবেচনা করতো। অধিকন্তু নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে তাদের যে ধারণা, তদনুসারে স্বহস্তে ভূমি চাষাবাদ করাও তাদের জন্যে অনুমোদনযোগ্য ছিলো না। তারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ভাড়া করা শ্রমিক দ্বারা তাদের ভূমি চাষাবাদ করাতো এবং এভাবেই ভূমির উৎপাদন থেকে লভ্যাংশ সংগ্রহ করতো। যে ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠিত প্রথার বাইরে চলে যেতো, সে সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক হেয় প্রতিপন্ন হতো এবং তার সমস্তরের লোকদের ভালো ধারণা লাভে বঞ্চিত হতো।

এ রীতি কেবল উচ্চস্তরের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও এর পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ছিলো। ইতিপূর্বে কোনো রাজপুতই তরবারির পেশা ব্যতীত

অন্য কোনো পেশার উমেদারি করতো না, কিংবা কোনো ব্রাহ্মণই ধর্মীয় পৌরোহিত্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসায় অবলম্বন করতো না। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই সংগে পুরনো ও অসুবিধাজনক রীতিও গেছে বদলে। রাজপুত জাতিও তাদের সম্প্রদায়ের বিধি নির্ধারিত ও অনুমোদিত জীবিকার্জনের উৎসের সীমিত পরিধির বাইরে চলে গেছে; তাদের পূর্ববিধি অনুযায়ী তারা কেবল একটিমাত্র পেশাতেই আবদ্ধ থাকতো। কিন্তু বর্তমানে তারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছে, এমন কি তারা এখন স্বহস্তে ভূমির চাষও করে থাকে। ব্রাহ্মণদের বেলায়ও সে একই কথা, তারাও এখন বিভিন্ন চাকরিতে নিযুক্ত, বিভিন্ন পেশার অন্বেষণে রত এবং ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় থেকেও তারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে থাকে; তাদের প্রধান একমাত্র নিষেধ নিজের হাতে লাংগল চালনা না করা। এই একটি মাত্র নিষেধ ছাড়া কৃষি সম্পর্কিত অন্য সমস্ত কার্যই তারা সম্পন্ন করতে পারে : কেননা সেই কাজ-গুলি কোদাল, বেলচা, কাস্তে কিংবা অন্যান্য যন্ত্র বা সরঞ্জাম দ্বারা সম্পন্ন করা যায় ; এগুলি ছাড়াও তারা বীজবপন, চারাগাছ রোপণ, আগাছা নিড়ানো, জমিতে জল-সেচন, শস্য কাটা, শস্য সংগ্রহ করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ করতে পারে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আগেকার দিনে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবিকার্জনের উপযুক্ত ও ভদ্রোচিত উপায় ছিলো অসামরিক ও সামরিক বৃত্তি এবং ভূসম্পত্তির আয়। কিন্তু যখন তারা এ সমস্ত উৎস থেকে জীবিকানির্বাহে ব্যর্থ হলো, তখনই তারা বিভিন্ন রকমের কারুশিল্প ও পেশা গ্রহণ করতে, বিভিন্ন চাকরি জীবনে প্রবেশ করতে এবং কৃষিসম্পর্কিত কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। সৈনিক শ্রেণীর মুসলমানগণ সামরিক

চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে অন্যান্য পেশা গ্রহণ না করে একমাত্র কৃষিকার্যকেই তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করলো। কেননা অন্য সমস্ত পেশাকে তারা তাদের মানসিক প্রকৃতির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করতো। কিন্তু উর্ধ্বতন মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি চাকরি এবং অধিকাংশ হস্তশিল্প খুবই অবমাননাকর পেশা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে; তাদের মধ্যে কেউ যদি এ সমস্ত নীচ পেশায় নিযুক্ত হয় তাহলে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকে এবং তাকে সামাজিক মর্যাদা হারাতে হয়। আগের দিনে বাণিজ্যকে সম্মানীয় পেশা হিসেবে বিবেচনা না করার ফলে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে কোন বড় বা ধনী বণিক নেই বললেই চলে; আর থাকলেও তা কেবল এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যেই আছে। হিন্দুস্তানের যে কোন অংশে যে সমস্ত বণিক ও দোকানদার দৃষ্ট হয় তাদের অধিকাংশই বণিক শ্রেণীভুক্ত হিন্দু পূর্বপুরুষদের বংশধর, যারা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরেও পূর্বপুরুষদের পেশাতেই নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের সন্তানদেরকেও একই পেশায় শিক্ষিত করে তুলেছে।

তথাপি খাঁটি সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান জাতির অন্তর্ভুক্ত কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে যদি বাণিজ্যরত দেখা যায়, যা খুবই দুর্লভ এবং তার অবস্থা যদি ঠিকভাবে তদন্ত করা হয় তাহলে বুঝতে পারা যাবে যে, সে খুব সম্ভবতঃ এদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়; কিংবা তা হলেও তখন বুঝতে হবে যে তার পূর্ব-পুরুষদের কেউ হয়তো কোন বড় রকমের সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হয়ে ও জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে এ পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, পূর্বে অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রথা প্রাচীন বলে সম্মানিত হতো

এবং যা ছিলো প্রকৃতপক্ষে অধিক পরিমাণে কঠোর ও বাধ্যতামূলক তাই তাদের ওপর অবিসংবাদিত প্রভাব বিস্তার করতো। এভাবে পুরনো প্রথার বলে তাদের পুঁজিবৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস অর্থাৎ বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারেনি এবং তারা এখন দারিদ্র্য ও শোচনীয় অবস্থার শেষ স্তরে পৌঁছেছে।

বাণিজ্যের বিস্তৃত পরিধির তুলনায় সরকারী চাকরির পরিধি ছিলো খুবই সীমাবদ্ধ এবং শেষোক্ত পেশার লাভের পরিমাণ ছিলো ব্যবসা বাণিজ্যের লাভের অনুপাতে বহুলাংশে কম। জমির পরিমাণও ছিলো সীমাবদ্ধ এবং কৃষিকার্যের মুনাফা ব্যবসা-বাণিজ্যের মুনাফার মতো এতো অধিক সমৃদ্ধি দিতে পারে না। সমস্ত পেশার মধ্যে কেবল বাণিজ্যেরই রয়েছে প্রশস্ততম পরিধি; এর মুনাফার সীমা নেই এবং এর সুবিধাও অপরিমিত। বাণিজ্য ছাড়া কোন জাতিই সম্পদের অধিকারী হতে এবং উন্নতি লাভ করতে পারে না। পৃথিবীতে বাণিজ্যরত জাতিগুলিই সকলের চাইতে অধিক ধনী এবং উন্নতিশীল। যারা বাণিজ্যকে পরিহার করেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে সম্পদাহরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে।

একই কারণে ব্রাহ্মণ ও রাজপুতগণ মুসলমানদের মতোই দরিদ্র এবং নিঃস্ব; অপরপক্ষে পৃথিবীর কোথাও কোন রাজ্যের অধিকারী না হয়েও ইহুদী জাতি তাদের বাণিজ্যিক প্রবণতা ও বাণিজ্যের আশীর্বাদে সর্বত্রই সমৃদ্ধ ও সচ্ছল অবস্থাপন্ন।

আমাদের সমধর্মাবলম্বিগণ যদিও ব্যাপক ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্যকে অননুমোদনযোগ্য বলে মনে করেনি, তথাপি তারা দোকানদারি ও খুচরা-বিক্রয়কে নীচ এবং অসম্মানজনক ব্যবসায়

বলে বিবেচনা করতো। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, দোকানদার এবং খুচরা বিক্রেতা হিসেবে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে হঠাৎ করে কারুর পক্ষে সফল বণিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কেবল মন্থর গতিতে ধাপের পর ধাপ অগ্রসর হয়ে যে কোনো কারুশিল্পে কিংবা বাণিজ্যে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে এবং সে সমস্ত পেশা থেকে মুনাফা লাভের আশা করতে পারে। প্রথমতঃ আমাদের এমন কোনো বিরাট পুঁজি নেই যে, যদ্দারা আমরা হঠাৎ খুব বড় বণিক হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এবং দ্বিতীয়তঃ যে পর্যন্ত না আমরা বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার মতো পদ্ধতি ও ধারা আয়ত্ত করতে পারি সে পর্যন্ত আমরা এর থেকে মুনাফা অর্জন করার এবং লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারি না। কোনো লোক যেমন আগে স্কুলের ছাত্র না হলে পরে কিছুতেই একজন পণ্ডিত অধ্যাপক হতে পারেন না, এই বাণিজ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারটিও তদ্রূপ। বর্তমান কালের চাইতে অতীত কালের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। অতীতকালে মানুষের পদ ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতো তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও যোগ্যতার ওপর, যার পক্ষে ধন-সম্পদের ভূমিকা ছিলো নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এখন ব্যাপার হয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং যাবতীয় প্রতিভা ও গুণাবলীর চাইতে অর্থই অধিকতর গুরুত্বশালী হয়ে পড়েছে. অধিকন্তু, অর্থ সাহায্য ব্যতীত যে কোনো সুকুমার চারু-শিল্প ও বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। বর্তমানকালে ধন-সম্পত্তির অধিকার থেকেই স্বাভাবিকভাবে সমস্ত খ্যাতি ও প্রাধান্য আসে এবং প্রতিটি বিষয় বা বস্তুই ধন-সম্পত্তির অধীন এমন কি ধন-সম্পদ না থাকলে কোনো লোকের

পক্ষে সম্ভ্রান্ত বংশগত মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে না, কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং গুণাবলীও খুব বড় একটা কাজে লাগে না। অতএব, বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত পুরনো ধারণানুসারে জীবনধারা পরিচালনাতেই দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা নিঃসন্দেহে বড় রকমের বোকামি। মানুষকে তার যুগের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে হবে এবং সৎ ও বৈধ উপায়ে অর্জিত ধন-সম্পদের দ্বারা তার সামাজিক পদ-মর্যাদা বজায় রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে; আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তাদের অবস্থার উন্নতি বিধান এবং অধিকতর সচ্ছল করা অবশ্য কর্তব্য। যখন আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ভালো বিচারবুদ্ধি ও বিজ্ঞতার কথা বিচার করি তখন আমরা আশা করতে পারি যে যদি তাঁরা বর্তমান যুগের মতো যুগে বাস করতেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের জীবনযাত্রা নির্বাহের রীতি নির্দিষ্ট করে যেতেন এবং তাঁদের সাধ্যানুসারে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে তাঁদের অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। কেননা, যে অবস্থাতেই পতিত হোন না কেন, নিজেদেরকে সেই অবস্থার উপযোগী করে চলাই হলো বিজ্ঞ লোকের পক্ষে সাধারণ কথা। পৃথিবীর অবস্থা সবদাই পরিবর্তিত হচ্ছে, পৃথিবীর এই পরিবর্তন হচ্ছে বলেই তদনুযায়ী আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের ধরনেরও পরিবর্তন করতে হবে। বিজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা ইহাই নির্দেশ দেয় যে, মানুষকে তাদের যুগের উপযোগী শ্রেষ্ঠতম উপায়ে তাদের জীবিকার্জন করা ও তাদের অবস্থার উন্নতি করা উচিত।

যাবতীয় পেশা সম্পর্কে উচ্চ ও সদ্বংশজাত মুসলমান অর্থাৎ সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠানদের মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন প্রথার কথা আমি পূর্বে বর্ণনা করেছি; সে বর্ণনা থেকে একথা স্পষ্ট

হয়েছে যে কলম ও তরবারির পেশা এবং ভদ্র কৃষকের কাজ ছাড়া বাদবাকি সব পেশাই তাদের নিকট নীচ ও অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হতো ; হিন্দুদের সর্বোচ্চ সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের মধ্যেও একই প্রথার প্রচলন ছিলো বিধায় একথা অনুমিত হতে পারে যে, মুসলমানেরা সম্ভবতঃ এ প্রথার ব্যাপারে হিন্দুদের অনুকরণ করেছে, কিংবা তারা ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পূর্ব-পুরুষদের বংশধর এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেয়ার পরেও তারা তাদের পূর্বপুরুষদের প্রথা তাদের উত্তর-পুরুষদের জন্যে রেখে গেছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এই একই প্রথা আরব, ইরান, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তানের উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিলো এবং কেবল তরবারি ও কলমের পেশাই এ জাতির নিকট সম্মানজনক পেশা বলে বিবেচিত হতো, অধিকন্তু, যেহেতু আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে কোনো হিন্দুই, তঃ সে যে কোনো শ্রেণীর বা যে কোনো সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, ধর্মে দীক্ষা নেয়ার পর চারটি প্রধান মুসলমান বংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না কেননা প্রকৃত সৈয়দ, শেখ, মোগল ও পাঠান তারাই — যাঁদের পূর্বপুরুষগণ আরব, ইরান, তুর্কিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ঐ সমস্ত বিদেশী পিতৃপুরুষই এ প্রথা এদেশে এনেছিলেন এবং তাঁরাই তাঁদের পরবর্তী বংশধরদের নিকট ইহা চালান করে গেছেন। হিন্দু বা মুসলমানদের কেউ পরস্পরের কাছ থেকে এ প্রথা গ্রহণ করেনি। কিন্তু এশিয়া মহাদেশের সমস্ত জাতির রীতিনীতি ও প্রথার মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য রয়েছে বলে কোনো এক জাতির কিছু রীতিনীতির সংগে অপর জাতিরও সেই রীতি-নীতির যথার্থ সামঞ্জস্য দেখা যায়।

অবশিষ্ট মুসলমানদের অর্থাৎ নিম্নতর সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন পেশা ও বাণিজ্যে নিযুক্ত বহু লোক রয়েছে। তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রতিটি শ্রেণী যে পেশা বা বাণিজ্যে নিযুক্ত, সেই পেশা বা বাণিজ্যের নামানুসারেই উক্ত শ্রেণীর পৃথক-ভাবে নামকরণ হয়েছে। যেমন—জোলা, ধুনিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে এই শ্রেণীগুলিতে দুই বংশের লোক রয়েছে: যারা বিদেশী পূর্বপুরুষদের বংশধর এবং যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত এদেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপজাতীয় লোকদের বংশধর। প্রতিটি শ্রেণীর লোক বংশানুক্রমে তাদের পূর্বপুরুষদের পেশাকেই অনুসরণ করে আসছে এবং তাদের নিজ নিজ পেশা ও বাণিজ্যই নির্দেশ করে যে তারা কোন্ সম্প্রদায় ও উপজাতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্ত মুসলমানের পূর্বপুরুষদের জন্ম এদেশে এবং এদেশীয় অন্য সম্প্রদায় ও উপজাতির লোকদের মধ্যে যারা তাদের মতো একই বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে কিংবা একই পেশায় নিযুক্ত আছে, নৃকুলতত্ত্বের দিক থেকে এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে খুব হীন এবং নোংরা পেশায় নিযুক্ত কোনো লোক নেই, যেমন আছে হিন্দুদের মধ্যে। কারণ বাংলার কোথাও ঝাড়ুদার, ময়লানিষ্কাশনকারী, চৌকিদার কিংবা এ ধরনের পেশায় নিযুক্ত একজন মুসলমানও নেই এ তথ্যটি লক্ষ্য করার মতো, কেননা ইহা প্রমাণ করে যে এমন কি নিম্নতম শ্রেণীর মুসলমানও নিম্নতম স্তরের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত নয়। আরব, ইরান প্রভৃতি দেশে এ ধরনের দাসোচিত পেশার যেরূপ অনুবৃত্তি হয় এদেশের মুসলমানদের দ্বারাও সেগুলির তদ্রূপ অনুবৃত্তিই

হয়ে থাকে। ঐ সমস্ত দেশে কোনো ঝাড়ুদার ও চৌকিদার নেই বলে এদেশের মুসলমানদের মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব নেই।

পূর্বে হস্তকৃত পেশাগুলি উচ্চতর শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে সাধারণতঃ অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হলেও নির্দিষ্ট এমন কতক-গুলি কাজ ও হস্তশিল্প ছিলো যেগুলিকে তারা সম্মানজনক পেশা হিসেবে গণ্য করতো এবং সে সমস্ত কারুশিল্পের নৈপুণ্যকে তারা বিশেষ গুণ বলে মনে করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সেলাইয়ের কাজ, সুঁচিকর্ম ও সুতাকাটার কাজ অভিজাত ও ভদ্র সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিলো। এ কারুশিল্পগুলি ছিলো দরিদ্র স্ত্রীলোকদের জীবিকার্জনের উৎস এবং অবসর সময়ে ধনীদের জন্যে এগুলি কাজ জোগাতো এ আলস্যের দুর্ভোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করতো। কাজেই এ পেশাগুলি সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিলো এবং এগুলিতে পারদর্শিতা অর্জনকে স্ত্রীজাতির একটি মস্তবড় গুণ বলে বিবেচিত হতো। এ ধরনের হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় বিক্রী করাটা তাদের পক্ষে কোনো প্রকারেই অসম্মান-জনক ছিলো না ঐ ধরনের পেশাগুলি মহিলাদের মধ্যেই একচেটিয়া ভাবে সীমাবদ্ধ ছিলো না, কিছুসংখ্যক ধার্মিক এবং খোদাভক্ত লোকও জীবিকানির্বাহের সব চাইতে খাঁটি ও সৎ উৎস মনে করে এসমস্ত পেশায় নিযুক্ত থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকজন বিখ্যাত রাজার জীবনী সম্পর্কে ইতিহাসে উল্লিখিত আছে যে, সমগ্র সাম্রাজ্যের রাজস্ব তাঁদের অধিকারে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা টুপি এবং এ ধরনের জিনিস তৈরী ও বিক্রী করার মতো হস্তকৃত শ্রমের দ্বারা তাঁদের নিজেদের জীবিকা সংগ্রহ করতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংগালী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমানদের মূল কি তা আমরা ইতিপূর্বে প্রমাণ করেছি এবং এদেশে তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণ কি তা-ও আমরা দেখিয়েছি। এখন আমরা এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট হিসেবে বাংগালী মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়ার ইচ্ছা করছি।

এদেশের মুসলমানগণ তাদের জাতীয় সরকারের আমলে সমৃদ্ধ ও সুখী অবস্থায় কালাতিপাত করতো; কিন্তু মুসলমান শাসনের পতন ও বিপর্যয়ের ফলে তারা নিজেদেরকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করে, যাতে তারা তাদের আশ্রয়াধীনে নিজেদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ভোগ করতে পারে। কিছুকালের জন্যে তাদের আশা পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিলো। যে পর্যন্ত তাদের আইন ও বিধিসমূহ বৃটিশ শাসনের মূলনীতি গঠনে সাহায্য করেছিলো, সে পর্যন্ত তারা বৃটিশ সরকার কর্তৃক এতো অধিক পরিমাণে-সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলো যে, ভবিষ্যতে কি হবে না হবে সে চিন্তা তাদেরকে খুব কমই করতে হয়েছে। বৃটিশ শাসনাধীনে তারা জীবন ও সম্পত্তির যে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ভোগ করেছিলো তা তাদের প্রতি যথার্থই খুব বড় রকমের অনুগ্রহ

স্বরূপ ছিলো। কিন্তু সরকারের মূলনীতি ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হতে লাগলো এবং পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে নতুন আদর্শের ওপর শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠিত হলো। কিন্তু মুসলমানগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিবর্তিত শাসনব্যবস্থার উপযোগী করে তাদের আচরণের ধারার ততটুকু পরিবর্তন করতে পারেনি এবং তারা তাদের আগেকার জীবনধারা ও পুরনো অভ্যাসের প্রতিই অনুগত রয়ে গেছে।

একদিকে মুসলমানগণ অংশতঃ অদূরদর্শিতা এবং অংশতঃ ধর্মীয় সংস্কারের জন্যে ইংরেজি শিক্ষা থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখলো ও তাদের জাতীয় সাহিত্য অথবা আরবী ও ফার্সী শিক্ষার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলো। তাদের এই পশ্চাৎপদতার ফল হলো এই যে, ইংরেজি শিক্ষা থেকে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত হলো। ব্যাপার যদি ভিন্নরূপ হতো তাহলে কি দাঁড়াতো! তাহলে সেক্ষেত্রে বাংগালী মুসলমানগণ এ সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বসবাসকারী তাদের দ্রুত উন্নতিশীল সমধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী থাকতো এবং এমন কি তারা রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতি-পত্তির দিক দিয়ে তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদেরকে অতিক্রম করে যেতো কারণ, এদেশের মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মুসলমানদের আগেই বৃটিশ জাতির সংস্পর্শে এসেছিলো এবং সূচনাতেই ইংরেজ শাসনের সংগে হিন্দুদের চাইতে অধিক পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলো।

অপরদিকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এদেশে নবাগত ছিলো বলে তারা মুসলমানদের আকাঙ্ক্ষা ও মনোভাবের কথা সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়নি; তাই তারা মুসলমানদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ করতো। ইংরেজ জাতির ধারণা ছিলো এই যে, তাদের হাতে মুসলমানগণ

শাসনক্ষমতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বভাবতঃই তারা শত্রুতা-মূলক মনোভাব পোষণ করবে এবং সুযোগ পেলেই তারা তাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ করবে। এই শাসকগোষ্ঠী আরো মনে করেছিলো যে, হিন্দুগণ এদেশের আদিম অধিবাসী বলে তাদেরকেই প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সাহায্য দান করা কর্তব্য। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মনোভাবের বশবর্তী হয়ে এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতী হয়ে বিদেশী শাসকগোষ্ঠী পূর্বোক্ত জাতিকে নিষ্পিষ্ট করতে এবং শেষোক্ত জাতিকে অত্যধিক সমাদর করতে লাগলো। কিন্তু এক পক্ষের প্রতি তাদের এই পক্ষপাতমূলক প্রবণতা এবং তার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অপর পক্ষের প্রতি বিরূপ মনোভাব যুক্তির দিক থেকে ছিলো সম্পূর্ণ অসমর্থিত। কেননা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কালেও মুসলমানেরা যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই ইংরেজদের স্বার্থের আনুকূল্য করেছে, তখন এ ধরনের শত্রুতা কার্যকরী করার মতো ক্ষমতা হারিয়েও তারা শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করবে, তাদের সম্পর্কে এ ধারণা কিভাবে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায়? কিংবা হিন্দুদেরকে এদেশের আদিম অধিবাসী হিসেবে মনে করার কথাটা কিভাবে যথার্থ হতে পারে, যেখানে কোল, ভীল, সাঁওতাল এবং এ ধরনের অনেক আদিমতম উপজাতি রয়েছে? এসমস্ত উপজাতিই ছিলো এদেশের আদি বাশিন্দা, হিন্দুরা নয়। হিন্দুরা যদি আর্য-গোত্রভুক্ত হয়ে থাকে, তাহলে এদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগে তাদের ও দেশীয় মুসলমানদের সম্পর্কের মধ্যে কেবলমাত্র এটুকু পার্থক্য বিদ্যমান যে, তারা মুসলমানদের আগমনের মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে মধ্য এশিয়া থেকে এদেশে এসেছে।

অবশেষে মুসলমানদের অপরিণামদর্শিতা এবং এতদসংগে কর্তৃপক্ষের বিদ্বেষমূলক আচরণ এই ভয়ানক ফলোৎপাদন করেছে

যে মুসলমানগণ রাষ্ট্রের যাবতীয় বিভাগের চাকরি থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পরিবারের মুসলমানদের ওপরই এ ক্ষতিকর অবস্থা সবচাইতে বেশী কার্যকরী হয়েছে। এ অবস্থার ফলে সমগ্র মুসলমান জাতির মধ্যে একই ভাগ্যের সম্মুখীন হওয়ার মতো আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানগণ, যারা এদেশে সংখ্যার দিক থেকে ছিলো সবচাইতে বেশী ও কৃষিকর্ম ছিলো যাদের পেশা এবং রাষ্ট্রীয় চাকরি লাভে ব্যর্থ হয়ে যারা কৃষি সম্পর্কিত পেশায় নিযুক্ত হয়েছে, তারাও দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে ; তাদের এই উন্নতির কারণ হচ্ছে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধ অবস্থা ও সেই সূত্রে কৃষি উৎপাদনের জন্যে উন্মুক্ত রপ্তানীর পথ এবং তদুপরি আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান। শ্রমিক গোষ্ঠীও তাদের বেতনের বর্ধিত ও বর্ধিষ্ণু হারের জন্যে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থায় আছে। কাজেই আমাদের মতে এদেশের উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলি ছাড়া বাদবাকী সমস্ত অধিবাসীই বৃটিশ শাসনের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এই উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রায় সকলেই শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয়েছে এবং তাদের অনেকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত ও সর্বস্বান্ত হয়েছে।

এখন আমাদেরকে বিচার করে দেখতে হবে যে, এ দেশের মুসলমানগণ বৃটিশ শাসনকে মেনে নিয়েছিলো কিনা এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য সম্পর্কে কোনো রকমের ভাব-প্রবণতা হৃদয়ে পোষণ করতো কিনা এ ব্যাপারে স্যার ডব্লিউ. ডব্লিউ হাণ্টার কিংবা কর্ণেল নসাউ লীজ যা খুশি তাই বলুন, কিন্তু আমরা নিজেরা এদেশের মুসলমান অধিবাসীদের জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে তাদের ভাব-প্রবণতার অবস্থা সম্পর্কে যতদূর

অবগত আছি তাতে আমরা পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত একথা বলতে পারি যে, আমরা মুসলমানেরা বৃটিশ সরকারের কম হিতাকাঙ্ক্ষী নই এবং এক মুহূর্তের জন্যেও আমাদের মনে এ ইচ্ছা পোষণ করি না যে রুশ শক্তি কিংবা এমন কি কাবুলের আমিরের হাতেও এদেশের বৃটিশ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হোক এবং এ দু'টি শক্তির যে কোনো একটি তাদের স্থান অধিকার করুক; যদিও কাবুলের আমির একটি প্রতিবেশী মুসলমান রাষ্ট্রের শাসক। প্রকৃতপক্ষে আমরা যা পাওয়ার জন্যে আকাঙ্ক্ষা করি তা হলো আমাদের নিজেদের উন্নতি ও নিরাপত্তা এবং আমাদের পক্ষে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই অন্যান্য ধর্মীয় কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে অন্যদের ক্ষতি না করে কিংবা তাদের প্রতি অন্যায় না করে আমাদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও সুবিধা লাভের চেষ্টা-করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের পবিত্র রসুল (তাঁর ওপর আল্লার শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি কাবার সীমানায় শান্তি ও নিরাপত্তা না থাকে তাহলে শান্তি ও নিরাপত্তার সন্ধানে এমনকি কাবা পরিত্যাগ করে আবিসিনিয়ার খ্রিস্টান রাজার রাজ্যে চলে যেতে হবে, যদি সেখানে তা পাওয়া যায়।[১] আমরা আমাদের রসুলকেই

১ ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ইহা কেবলমাত্র মক্কার হাশেমি বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো এবং সংশয়বাদী কোরাইশদের বিরুদ্ধে আশ্রয়লাভের জন্যে মুহম্মদ প্রধানতঃ তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন, তাঁর নবুয়তের সেই পঞ্চম বছরে প্রথম হিজরা অর্থাৎ অত্যাচারের দেশ থেকে 'যেখানে কেউ অন্যায় আচরণের সম্মুখীন হয়নি সেই ন্যায়ের দেশে' পলায়নপর্ব সংঘটিত হয়। এ দেশটি ছিলো 'ন্যায়পরায়ন রাজা' নাজাসি কিংবা নিগাস কর্তৃক শাসিত খ্রিস্টান রাজ্য আবিসিনিয়া। এ ঘটনার সময় হযরতের সংগী ছিলেন তদীয় জামাতা ও আফফানের পুত্র হযরত ওসমান এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ

অনুসরণ করি, তাঁর নির্দেশ পালন করি এবং তাঁর নির্দেশিত পথেই আমরা আমাদের উন্নতি লাভের চেষ্টা করি। আমাদের প্রতি এবং আমাদের পতনশীল অবস্থার প্রতি সরকারের ঔদাস্য সম্পর্কেই আমাদের একমাত্র অভিযোগ। আমাদের এ অভিযোগ উত্থাপনের কারণ হলো সরকারের এ ধরনের ঔদাস্য এবং উপেক্ষার জন্যেই আমরা ক্রমে ক্রমে অবনতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু এ অভিযোগকে যদি কেউ মুসলমানদের রাজদ্রোহের লক্ষণ বলে খামখেয়ালীভাবে ও অন্যায়রূপে ব্যাখ্যা করতে চায়, করুক। আমাদের ন্যায্য অংশ না পাওয়ার ব্যাপারে আমরা আমাদের শাসক গোষ্ঠীর ভুলের শিকার হয়েছি বলে সরকার তাঁর পিতৃসম তত্ত্বাবধানের দ্বারা আমাদের দাবির প্রতি কি সুবিচার করেন তা দেখার জন্যে আমরা অধীর আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করছি। যাহোক, আমরা বিশ্বাস করি যে, যখন আমাদের শাসকগণ আমাদের সহিত আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবেন তখন তাঁরা অবশ্যই আমাদের প্রতি অধিকতর সুবিচার প্রদর্শন করবেন।

হযরতের কন্যা। এখানে স্বদেশত্যাগী প্রবাসিগণ সদয় ব্যবহার লাভ করেছিলেন এবং তাঁদেরকে সে দেশ থেকে বিতাড়নের জন্যে কোরাইশদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো। পরের বছর অর্থাৎ হযরতের নবুয়তের ষষ্ঠ বছরে মক্কার অত্যাচার তীব্রতর আকার ধারণ করলে তখন থেকে দ্বিতীয় পলায়ন পর্ব সংঘটিত হয়। এই দ্বিতীয়বার দেশত্যাগীদের সংখ্যা প্রথমবারের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো; আমাদের প্রাপ্ত খবর থেকে জানা যায় যে, এই খৃস্টান রাজ্যে বিশ্বাসীদের সংখ্যা তাঁদের শিশু সন্তানদের ছাড়াই ১০১ জনে পৌঁছেছিলো। এখানে তাঁরা সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে লাগলেন; তাঁদের অনেকেই ইসলামের বিজয় অভিযানের বহুদিন পর পর্যন্তও সেখানেই ছিলেন এবং হিজরির সপ্তম সালে খায়বার অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা হযরত মুহম্মদের সাথে পুনর্মিলিত হননি।'—রওযাত-উস-সাফা।

প রি শি ষ্ট

প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে টীকা

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমার থেকে জানা যায় যে, বাংলা দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ১৯৫৩৬২০ জন বৃদ্ধি পায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তাদের সংখ্যা ছিলো ২১৭০৪৭২৭ জন এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ছিলো ১৩৬৫৮৩৪৭ জন। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে ইসলামের ধর্মান্তরিত-করণ বৈশিষ্ট্যের ফলে কিছু লোক এধর্মে দীক্ষা নিয়েছে বটে, কিন্তু ১৮৮১—১৮৯১ দশকে অন্যান্য ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত লোকের সংখ্যা এই সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে খুব বেশী সাহায্য করতে পারেনি। এ ব্যাপারে আদমশুমারের রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট অফিসার যে মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ ও নির্ভুল। তিনি বলেছেন: 'একথা সত্য যে মূল বাংলায় মুসলমান ধর্মের বৃদ্ধি বিশ্বাস-সম্পর্কিত প্রভাবের চাইতে বরং দৈহিক প্রভাবের সংগেই অধিক পরিমাণে জড়িত।' একথা পরিসংখ্যানের সাহায্যে প্রমাণিত হয় না যে, বাংলার যে কোনো অঞ্চলে খুব বেশী সংখ্যক ধর্মান্তরিত ব্যক্তি আছে যারা ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে অমুসলমান ছিলো কিন্তু বিগত দশ বছরের মধ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে; কিংবা সংখ্যার দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় না যে বাংলার কোনো একটি নির্দিষ্ট জেলায়

মাত্র কয়েকশত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারে প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির আংশিক কারণ ছিলো বিগত আদমশুমারে অবলম্বিত লোকগণনার উন্নততর ব্যবস্থাবলী। কিন্তু এই আংশিক কারণ ছাড়াও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি প্রধান কারণ ছিলো। আগে মুসলমানদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান ছিলো যে আদমশুমারের উদ্দেশ্য হলো মাথাপ্রতি নতুন কোনো কর ধার্য করা কিংবা তাদের মধ্য থেকে সেনাবাহিনীর জন্যে লোক সংগ্রহ করা; এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা তাদের প্রকৃত সংখ্যা গোপন রাখতো; কিন্তু এখন তারা কালাতিক্রম ও অভিজ্ঞতার দ্বারা এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছে বলে এখনকার আদমশুমারে তারা তাদের ও তাদের পরিবারস্থ সমস্ত লোকের প্রকৃত সংখ্যা জানিয়েছে। তাছাড়া মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি বেশী পরিমাণে নির্ভর করে বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহের ওপর, যা বিশেষভাবে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলির অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা অগ্রগামী। মুসলমানেরা বিভিন্ন প্রকারের পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করে থাকে বলে সবলতর দৈহিক গঠনের অধিকারী এবং ইহা তাদের দৈহিক পুষ্টি ও সন্তানোৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি করে। এরূপে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমার যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করে তা হলো মূল বাংলার মুসলমানেরা বিগত উনিশ বছরের মধ্যে কেবলমাত্র তাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভাইদের সংখ্যাসাম্যই অর্জন করেনি, উপরন্তু পনেরো লক্ষ সংখ্যায় তাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে।